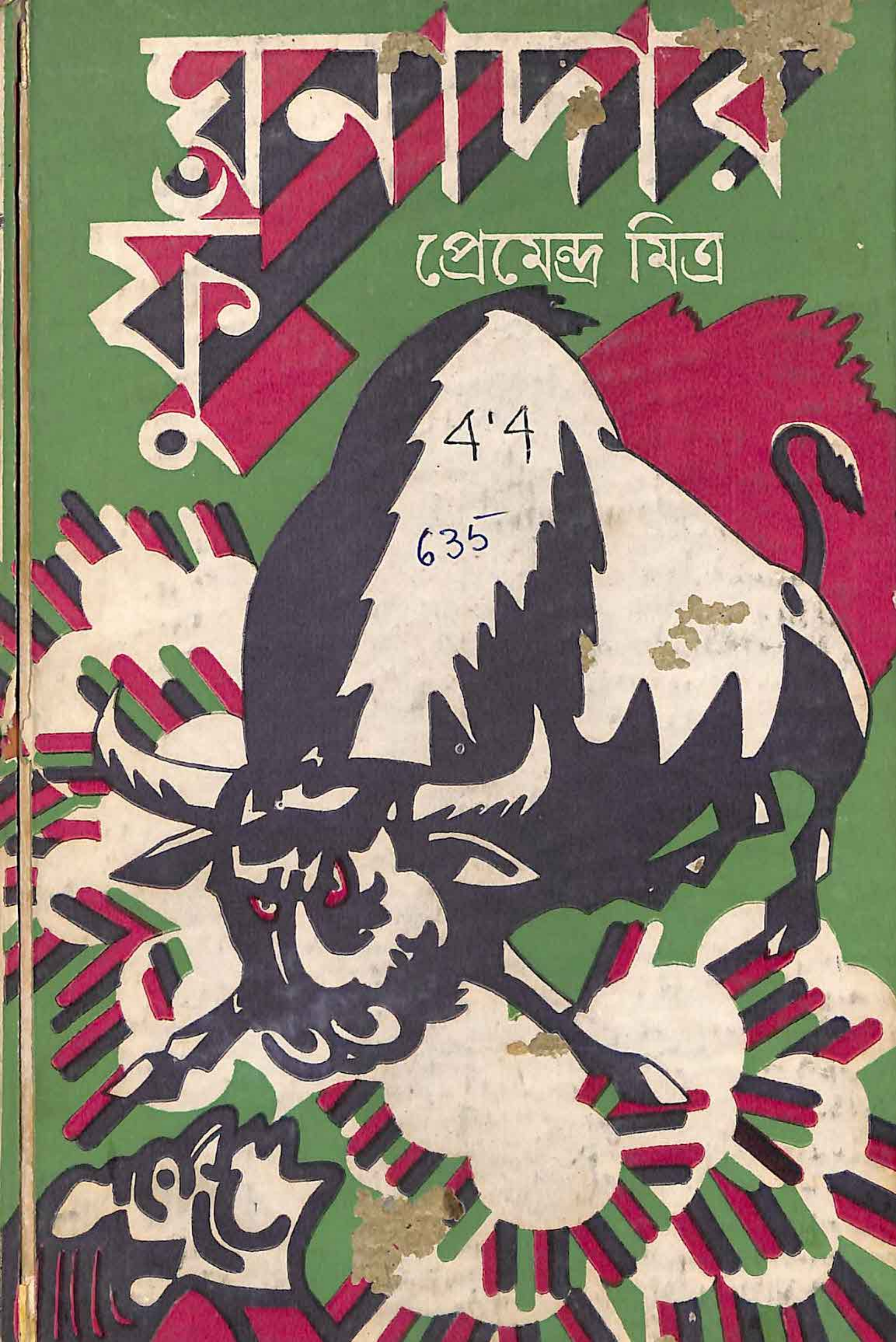

ঘনাদার ফু
প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার ফুঁ

ঘনাদার ফুঁ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৮ ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৮

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ধ্রুব রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১০·০০

সম্বরণ চট্টোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই :

আগ্রা যখন টলমল
যাঁর নাম ঘনাদা
তেল দেবেন ঘনাদা

সূচীপত্র

ঘনাদার ফুঁ

জ্দ্শী : বলেছেন ঘনাদা।

মাথার ঘিলু ঘোলানো চক্ষু ছানাবড়া করা উচ্চারণটা শুনতে কিছু ভুল হয়েছে কি না বুঝতে না পেরে আমাদের হতভম্ব মুখ দিয়ে অজান্তে এই শব্দটাই আপনা থেকে আবার বেরিয়েছে,—জুদশী!!!

হ্যাঁ, জুদশী!—আমাদের মাথাগুলো আরো চরকি পাকে ঘুরিয়ে ঘনাদা বলেছেন—সব কিছু একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

এরপর ঘনাদা আরো একটু বিশদভাবে আমাদের যা বুঝিয়েছেন, তাতে ঘনাদার সঙেগ আমরা দুই-এ দুই-এ চার-এর জগতে আছি না কোন ভেল্কিতে হঠাৎ আয়নার ওপিঠের আবোল-তাবোলের মুল্লুকে চালান হয়ে গেছি, এই ধোকায় পড়ে খানিক প্রায় বোবা আর বে-এক্তিয়ার হয়েই থেকেছি। ঘনাদার আড্ডাঘর ছেড়ে চলে যাওয়াটা আটকাবার চেষ্টা করতেই পারিনি।

আচমকা জুদশী'র এই মাথার ঘিলু ঘোলানো বিভ্রান্তিতে পেঁছোবার জন্যে তার আগের ইতিহাস একটু জানা দরকার।

সে ইতিহাস এক হিসেবে দারুণ সেই বিস্ফোরণ থেকেই সুরু বলা যায়।

কোথাকার কি বিস্ফোরণ না বলতেই কেউ কেউ কিছুটা বুঝেছেন নিশ্চয়। ঠিকই তাঁরা বুঝেছেন।

বাহাত্তর নম্বরে বিস্ফোরণ! হ্যাঁ, প্রায় পারমাণবিক বিস্ফোরণই বলা যায়।

সেই বাপী দত্ত বিগড়ি হাঁস খাইয়ে খাইয়ে আমাদের পেটে চড়া পড়িয়ে এ মেস ছেড়ে যাবার পর থেকে এমন হুলুস্থুলু কান্ড আর হয়নি।

গৌরের সেই ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী তেলের শিশির সেই নিদারুণ পরিণামের পরও বাহাত্তর নম্বরে এমন সাংঘাতিক সংকট দেখা দেয়নি।

কারণ এবার গৌর, শিবু কি আর কেউ ত নয়, ক্ষেপেছে স্বয়ং

শিশির। সেই শিশির যার শরীরে সত্যিকার রাগ আছে বলে আমরা কখনো জানতে পারিনি।

কিন্তু সেই শিশির এখন একেবারে যেন বাহাত্তর নম্বরে দাবানল।

দাবানলটা যে হঠাৎ তুমুল হয়ে উঠবে, তার আভাস কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে থাকতেই আমাদের পাওয়া উচিত ছিল। আভাস যে পাইনি তাও ঠিক নয়। কেমন একটু কোথায় যেন ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলাম। তবে সেটা নেহাৎ ধোঁয়া বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

ধোঁয়ার আভাসটা ছিল শিশিরের নতুন এক বাতিক।

যখনই সময় সুবিধে পায় শিশির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে কি যে দেখে প্রথমটা বোঝা যায়নি।

আমরা ঠাট্টায় সরব হয়ে তখনও উঠিনি। মুখ টিপে শুধু হাসা-হাসি করি। সরব ঠাট্টার খোঁচাটা গৌরই প্রথম দিলে।

আমাদের দোতালায় আড্ডাঘরে আর যাই থাক আয়না-টায়নার কোন বালাই নেই।

শিশিরকে কিছুদিন থেকে আড্ডাঘরে সময়মত দেখা যায় না। এলে একটু দেরি করেই আসে। কোন কোন দিন তার দেখাই পাওয়া যায় না।

দেখা যখন পাওয়া যায় তখনও কেমন গম্ভীর অন্যমনস্ক। কি যেন একটা ভাবনা ওর ওপর চেপে আছে।

সুস্থ সবল নির্ঝঞ্ঝাট ছেলে। তার হঠাৎ এমন গুরুতর ভাবনার ব্যাপার কি হতে পারে? আর সে ভাবনার সঙ্গে ফাঁক পেলেই আয়নায় ঘন ঘন চেহারা দেখার সম্বন্ধটা কি?

শিশির কি হঠাৎ সিনেমার হিরো হবার কথা ভাবছে নাকি! চেহারা নিয়ে তাই এত মাথাব্যথা!

সেদিন আমাদের সবাইকার পরে শিশির অমনি অন্যমনস্ক চেহারা নিয়ে আড্ডাঘরে এসে ঢোকবার পর গৌর খুব গম্ভীর হয়ে প্রস্তাব করলে—আচ্ছা, আমাদের এ বৈঠকের ঘরে একটা বড় আয়না রাখলে হয় না? কি বলিস শিশির?

অ্যাঁ? শিশির কথাটা যেন বুঝতেই না পেরে প্রথমটা কেমন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আয়না?

হ্যাঁ,—গৌর গম্ভীর মুখেই ব্যাখ্যা করে বোঝালে, এই আড্ডাঘরে একটা বড় আয়না রাখার কথা বলছি। কত সুবিধে হয় বল ত? যখন খুশি চেহারা-টেহারা দেখে ঠিক করে নিতে পারি।

আমরা তখন কোন রকমে মুখ ঘুরিয়ে মাথা নিচু করে হাসি



চাপবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু এত বড় একটা মোটা ঠাট্টার খোঁচা শিশির যেন টেরই পেল না। ক্ষুণ্ণ হওয়া কি রেগে ওঠার বদলে ও ধার দিয়েই না গিয়ে গম্ভীরের সঙ্গে একটু যেন করুণ হয়ে একেবারে অন্য লাইনে চলে গেল।

এখানে আয়না?—একটু বিব্রত হয়েই আপত্তি জানিয়ে সে বললে, না না, এখানে আয়না রেখে কোন লাভ নেই। আর নিজে নিজে দেখে ঠিক কিছু বোঝাই যায় না।

ঠাট্টার খোঁচা দিতে গিয়ে আমরাই তখন হতভম্ব। আবোল-তাবোল কি বলছে শিশির? আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে মাথাটাতেই গোলমাল হয়ে গেল নাকি? কথার সঙ্গে কথার কোনো জোড়-ই নেই যে!

জোড়টা কোথায় শিশিরের পরের কথায় কিছুটা বোঝা গেল। আমাদের একেবারে অবাক করে দিয়ে শিশির বেশ একটু ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা তোরা কিছু বুঝতে পারছিস?

কি বুঝব আমরা!—আমাদের হতভম্ব জিজ্ঞাসা।

এই, মানে,—এই,—শিশির একটু আমতা আমতা করে বললে,—আমার চেহারা কি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

খানিকক্ষণ আমাদের কারুর মুখে আর কথা নেই।

গৌরই প্রথম সামলে উঠে জিজ্ঞাসা করলে,—তোর চেহারা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে কি না তাই আমাদের কাছে জানতে চাইছিস? চেহারা খারাপ হচ্ছে কি না বোঝবার জন্যে তুই আজকাল আয়না নিয়ে এত মত্ত?

হ্যাঁ, শিশির বেশ হতাশ সুরে বললে,—কিন্তু নিজে দেখে কিছু বোঝা যায় না। এই একদিন মনে হয় একটু বোধ হয় চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়েছে, তার পরের দিন বেশ ফ্যাকাশে দেখায়। গালের হাড় দুটোর ওপর ত রোজ দুবেলা নজর রাখি, কিন্তু এবেলা একটু পুরন্ত মনে হলে ও বেলা ঠিক একটু করে ঠেলে উঠেছে বোঝা যায়। তাই বলছি—ও আয়নায় নিজে দেখে কিছু বোঝা যায় না।

কিন্তু চেহারা নিয়ে অত বোঝাবুঝির দায়টা কিসের?—আমি জানতে চাইলাম—তোর হয়েছেটা কি?

কি হয়েছে?—শিশির এবার একটা মডেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল, —কি হয়েছে তা যদি জানতেই পারতাম!

*　　*　　*

হ্যাঁ, এই ভাবেই সুরু। তারপর দিন দিন মাত্রা চড়েছে।

প্রথমে শুধু চেহারা দেখা আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল।

সেই সঙ্গে একটু একটু আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ।

যেমন,—আজ সকালের কাসিটার আওয়াজ শুনলি?

কাসির আওয়াজ...!—আমরা সত্যিই বেশ অবাক—কাসির আওয়াজ আবার কোথায়? কার কাসি?

কার কাসি আবার? আমার কাসি।—শিশির বেশ ক্ষুব্ধ আমাদের উদাসীনতায়—আজ সকালে কি রকম কাসলাম শুনলি না? খেয়ালই করিসনি বোধ হয়।

খেয়াল করব না কেন? করেছি বলেই জোর দিয়ে বলতে পারি, —ওই সকালের কাসির কথা বলছিস। সে আবার কাসি কোথায়! ও ত তুই ডিমের পোচ খেতে গিয়ে বিষম খেলি!

বিষম খেলুম—শিশির যেন অপমানিত—তোরা ত তাই বলবি; বলে রেগে উঠেই চলে যায় ঘর থেকে।

তখন রাগে সঙ্গ ছেড়ে গেলেও ছাড়াছাড়িটা স্থায়ী নয়। শারীরিক দুঃসংবাদ দেবার জন্যে আবার আমাদের কাছেই আসতে হয়।

কাল রাত্রে কিরকম ঘাম হয়েছে জানিস? শিশির গভীর হতাশা ফুটিয়ে তোলে তার গলায়।

ঘাম? কাল রাত্রে ঘাম!—আমরা হেসে না উঠে পারি না।

হাসতে হাসতেই গৌর বলে—কাল রাত্রে গুমোট গরমের ওপর লোড শেডিং-এ পাখা বন্ধ। কার না ঘাম হয়েছে কাল। আমাদেরও ত হয়েছে।

তা তোদের হতে পারে। কিন্তু আমার ঘাম আলাদা!—বলে নিজের সাংঘাতিক ঘামের গর্বে আর দুঃখে শিশির আমাদের সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দেয় কিছুক্ষণ।

সুরুতে এই গুমোট আগুনের আঁচ আর ধোঁয়াটুকুই ছিল।

এ সুরুর অবশ্য আরো আগের সূচনা আছে। সে সূচনা হল শিবুর একটি মারাত্মক আহাম্মকী থেকে।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে ডাক্তারী শিখে দাতব্য চিকিৎসা করে দেশের সেবা করবে।

এ সংকল্পের তাগিদে,—না, কোথাও মেডিক্যাল কলেজ কি স্কুলে ভর্তি হয়নি। বাজার থেকে একটি মহাভারতপ্রমাণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই কিনে এনেছে।

কিনে আনার পর কি তার আস্ফালন। বইটা বেশ একটু কোঁৎ-

পেড়ে তুলে ধরে আমাদের দেখিয়ে বলেছে,—জানিস কি রকম বই এটা! দুনিয়ায় হেন রোগ নেই—যার চিকিৎসার কথা এখানে পাবি না।

শিবুর কিন্তু বইটা পড়ে দাতব্য চিকিৎসা করা আর হয়ে ওঠেনি। তার বদলে বইটা পড়তে সুরু করেছে শিশির।

আর সেই থেকেই একটু একটু করে অ আ ক খ-র ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে সে বুঝেছে যে, যে অক্ষরের পাতায় সে এখন পেঁাছেছে, তা পর্যন্ত দেওয়া সব ক'টি রোগের সে একটি ডিপো।

অ থেকে এসে ক-এ ষ-এ ক্ষ-এ পেঁাছে তাই সে প্রতিদিন সাংঘাতিক সব লক্ষণ নিজের মধ্যে আবিষ্কার করতে সুরু করেছে।

লক্ষণ ত একটা নয়, অনেক; আর সব যে একেবারে 'বৃহৎ চিকিৎসা-বারিধির' বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে শিশির তা বিশদভাবে আমাদের বুঝিয়েছে—এই যেমন সকাল বিকেল তার দারুণ ক্ষিদে পাওয়া। এটা ত আর তার নিজের নয়, এ হল তার রোগের রাক্ষুসে হ্যাংলামি।

আর ওই যে ঘুম। এত সব দুর্ভাবনা থাকলেও বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা ঠেকাতেই যে ঘুমে বেহুঁশ হয়ে যায় এ তো একেবারে সাংঘাতিক খারাপ লক্ষণ!

শিশির নিত্য নূতন এমনি সব লক্ষণ আবিষ্কার করে আমাদের শোনায় আর আমরা ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে আর উৎসাহ না পেয়ে তার জন্য রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠি।

বাহাত্তর নম্বরের এত বড় যখন সমস্যা, তখন সেই টঙের ঘরের সেই তিনি করছেন কি? তিনি কি আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, না তাঁর শরণ আমরা নিতে চাইনি।

না, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেননি, বহাল তবিয়তেই তাঁর টঙের ঘরে বিরাজ করছেন, আর আমরাও তাঁর শরণ নিতে ভুল করিনি।

কিন্তু ভাগ্যের দোষে চালটা যেন কেমন কেঁচে গিয়েছে। শিশিরের রোগের সেই গোড়ার দিকেই খেইটা ঘনাদাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। ঘনাদা সেদিন সবে এসে তাঁর মৌরসী কেদারাটিতে গা এলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রাত্যহিক অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের একটু ত্রুটি হয়েছে বলেই মুখটা খুব প্রসন্ন দেখায়নি।

তিনি এসে আরাম কেদারাটি দখল করার পরেই শিশির তার ডান হাতের তুলে ধরা তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে একটি সিগারেট

গুঁজে দিয়ে ভক্তিভরে লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে এই হল বাহাত্তর নম্বরের দস্তুর।

কিন্তু শিশিরই তখনো ঘরে আসেনি, এ অনুষ্ঠান আর পালন করবে কে?

খানিক বাদে শিশির অবশ্য এসেছে কিন্তু এ ত অন্য শিশির। কেমন অন্যমনস্ক ভাবে মনটা যেন আর কোথাও ফেলে রেখে এসে একটা চেয়ারে বসেছে শুধু।

শিশিরকে দেখে ঘনাদা উৎফুল্ল হয়ে স্বাগত জানিয়েছেন,—এই যে শিশির।

শিশির তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে। সিগারেট সে যে হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছে, তা না জানাক, একটু হেসেও ঘনাদার সম্ভাষণের মান রাখেনি। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ডান হাতের কব্জি ধরে সে তখন তার নাড়ি দেখতে তন্ময়।

ঘনাদা ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়েছেন, আমরাও অস্বস্তি চাপা দিয়ে আসল কথাটা তোলবার সুযোগ নিয়েছি ওই নাড়ি টেপা থেকেই।

নাড়িটা আজ কি রকম দেখছিস!—জিজ্ঞাসা করেছে গৌর।

খুব খারাপ, খুব খারাপ!—শিশির যেন তার ফাঁসির হুকুম শুনিয়েছে, আঙুলে একেবারে স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে।

বলতে পারতাম,—তা যাবে না ত কি, নাড়ি ছেড়ে গেছে মনে হবে! কিন্তু তা না বলে খেইটা ওইখান থেকে ধরাবার চেষ্টা করেছে শিবু। বলেছে, খুব গম্ভীর হয়ে,—নাড়িটা আপনি একবার দেখুন ত ঘনাদা?

বরাদ্দ মাফিক সিগারেটের নজরানা না পেয়ে ঘনাদার মেজাজ এমনিতেই তখন খিঁচড়ে আছে! নাড়ি দেখার অনুরোধে হঠাৎ তেতো চিবিয়ে ফেলার মত মুখ করে বলেছেন, কি দেখব? নাড়ি? কার নাড়ি?

তাঁর মুখের চেহারা লক্ষ্য করতে গেলে আমাদের তখন চলে না। সে দিকে যেন চোখই না দিয়ে মিনতি করেছি,—ওই শিশিরের নাড়িটা একটু দেখতে বলছি। ও ক'দিনে কি রকম শুকিয়ে গেছে তাও একটু যদি দেখেন।

মুস্কিল আসান হয়ে সব গোল মিটে যেতে পারত ঘনাদাকে একটু কেরামতি দেখাবার সুযোগ তখন দিলেই।

কিন্তু তা হবার নয়।

'বৃহৎ চিকিৎসা বারিধি'তে নতুন কি পড়ে জানি না, তার মেজাজ সেদিন একেবারে যেন বুনো কাঁটা নটে। ঘনাদার নাড়ি দেখবার কথায় জিভে যেন ক্ষুর এঁটে বলেছে—ঘনাদা দেখবেন! কি দেখবেন উনি শুনি? ওঁর চোখে কি এক্স-রে আছে, না ওঁর আঙুলগুলো ই সি জি-র যন্ত্র, ডাক্তারী মানে আজকাল কি তা উনি জানেন? মাণ্টু টেস্ট, ই এস আর, স্টারন্যাল পাংচারের নাম শুনেছেন কখনো? কি জানেন উনি এ সব ব্যাপারে?

সর্বনাশা ব্যাপার। সভয়ে আমরা এবার ঘনাদার দিকে তাকিয়েছি। বাহাত্তর নম্বরের টঙের ঘর বুঝি চিরকালের মত খালিই হয়।

কিন্তু না, সে রকম কোন লক্ষণ নেই। তার বদলে ঘনাদার মুখে রহস্যময় প্রশান্ত এক হাসি আর সেই সঙ্গে আমাদের মাথার ঘিলু ঘোলানো চক্ষু-ছানাবড়া করা উচ্চারণটুকু—জুদশী!

অ্যাঁঃ—নিজেদের অজান্তেই আমাদের গলায় বিহ্বল বিস্ময়ের প্রশ্নটা বেরিয়েছে—জুদশী!!

হ্যাঁ,—আমাদের মাথাগুলো একেবারে চরকি পাকে ঘুরিয়ে ঘনাদা বলেছেন,—সব কিছু একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। সেনাপতি ঘোর জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিলেন পথ হারিয়ে, মন্ত্রী খুঁজে খুঁজে গাছ কাটলেন ভোঁতা কুড়ুলে। বোটকা বুনো গন্ধই ছড়াল। রাস্তা বেরুল না। শেষে রাজা এসে জঙ্গলই জ্বালিয়ে উনুন পেতে বসালেন। ব্যস্ তাতেই কাম ফতে! কিন্তু রাজার নাগাল পাচ্ছে কে?

কথাগুলো বলেই ঘনাদা কেদারা ছেড়ে উঠে—গট্‌গট্ করে ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে তাঁর টঙের ঘরে উঠে গিয়েছেন। শিশিরের বেয়াড়া ব্যাধির ছোঁয়াচে ঘনাদারই হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, না, আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে বুঝতে না পেরে দিশাহারা অবস্থায় ঘনাদাকে ডেকে থামাবার চেষ্টা পর্যন্ত আমরা কেউ করতে পারিনি।

চেষ্টা করলেও লাভ কিছু হত বলে মনে হয় না, কারণ ঘনাদা এক রকম যেন অটল জেদ নিয়েই আমাদের ছেড়ে গেছেন। আর সেই যে গেছেন তারপর থেকে আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখছেন না বললেই হয়।

তা না রাখুন। বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে যাবার হুমকি যে দেননি বা এখানকার হেঁসেলের অন্ন স্পর্শ না করবার গোঁ ধরেননি এই আমাদের ভাগ্যি।

তাঁকে নিজের খুশিমত থাকতে দিয়ে শিশিরকে নিয়েই আমাদের

ব্যস্ত হতে হয়।

ঘন ঘন একটু আয়না দেখা আর নাড়ি টেপা থেকে বাতিকটা শিশিরের তখন ক্রমশ গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ ডাক্তার থেকে সে ডাক্তার, অ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথি, তা থেকে ইউনানী ত বটেই, সেই সঙ্গে ওষুধ কেনা আর তা বাতিল করার সে কি সৃষ্টি-ছাড়া ক্ষ্যাপামি!

ওষুধ মানে অবশ্য শরীরের তাকত বাড়াবার সালসা অর্থাৎ টনিক যে বাজারে এত আছে তাই কে জানত। কোন টনিকই শিশির কিনতে বাকি রাখে না, দু'দিন বাদে ব্যাজার হয়ে বাতিল করতেও তার দেরি হয় না।

এক ভিটামিন টনিকের বোতল সিকি না খরচ হতে হতে আসে কডলিভার অয়েলের শিশি, সেটার দু চামচ পেটে যেতে না যেতেই বাতিল হয়ে গ্লিসেরো ফসফেট না কি সব নার্ভ টনিককে জায়গা করে দেয়। ন্যার্ভ টনিকের রাজত্বও দু-চারদিনের বেশী টেকে না। তারপর ঝাড়েবংশে সব অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ নিয়েই তাকে বিদেয় হতে হয়। তার জায়গায় যারা আসে সেই হকিমি ইউনান। সালসাও বেশী দিন কেউ পাত্তা পায় না। শিশিরের ঘরের শিশি বোতলের কাঁড়ি সাফ করতে বনোয়ারীকে ঘন ঘন শিশি-বোতল বিক্রিওয়ালা ডাকতে হয় রাস্তা থেকে।

বাজারের জানা অজানা সব টনিক পরীক্ষা শেষ হলে পর শিশিরের এ রোগ যদি সারে এই আশায় যখন দিন গুনছি, তখন হঠাৎ একদিন এই সালসার পাত্র থেকেই বাহাত্তর নম্বরের অমন একটা বিস্ফোরণ হবে ভাবতেও পারিনি।

আজকাল শিশিরের রোগের ওষুধ যেমন পথ্যিও তেমনি একটু আলাদা। শিশির আমাদের আর সকলের আগেই দিনে রাত্রে তার খাওয়াটা তাই সেরে আসে।

সেদিন সে তাই নিয়েছিল।

হঠাৎ নিচে থেকে তার একেবারে বাড়ি-ফাটানো চিৎকার শুনে আমরা সবাই তাজ্জব! কি, হল কি শিশিরের? তার রোগের বাতিক এতদিন যা দেখে আসছি তা ত এমন বিকারের প্রলাপে দাঁড়াবার মত কিছু নয়।

হুড়মুড় করে সবাইকে নিচে নেমে যেতে হল তৎক্ষণাৎ। শিশির তখন আমাদের খাবার টেবিলে ঘুষি মেরে চীৎকার করছে,—এ বাড়ির মেস করা আমি ঘুচিয়ে দেব! বাড়িওয়ালাকে দিয়ে নোটিশ দেব

সকলকে ঘাড় ধরে বার করবার। আর কিছু না হোক ঘুন ধরা 'কন্-ডেম্ন্ড' পোড়ো বাড়ি বলে করপোরেশনকে দিয়ে ভাঙিয়ে ছাড়ব। আর ওই টঙের ঘর সবার আগে গুঁড়ো করতে পারি কি না তাই দেখাচ্ছি!

শিশিরের খাবার টেবিলের ওপর একটা অর্ধেক খালি কাঁচের ছোট জার, আর তার এলোমেলো আর্তনাদ মেশানো। আস্ফালন থেকে ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময়ই লাগল।

ব্যাপারটা যা বুঝলাম তা অবশ্য রীতিমত গুরুতরই বলতে হয়। অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ইউনানী হাকিমী ছেড়ে শিশির সম্প্রতি কবিরাজীর শরণ নিয়েছে। আর দু' পকেট প্রায় খালি করে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী এক কবিরাজকে দিয়ে দুনিয়ার সেরা বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত তৈরী করিয়ে এনেছে ওই কাঁচের জারে। জারটা সুবিধের জন্যে নিচে রামভুজের কাছেই থাকে, সকাল বিকেল চা জলখাবারের সময় শিশিরের যাতে খেতে ভুল না হয়।

টঙের ঘরের তাঁর ওপর কেন শিশির এতখানি খাপ্পা তা বুঝতে এরপর আর দেরি হল না।

শিশির বিবরণটা দিতে দিতেও একেবারে যেন চিড়বিড়িয়ে উঠে ওপর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—আর উনি, তোমাদের ওই উনি সেই সাত রাজার ধন ওষুধ খাবলা খাবলা নিয়ে ভাতে মেখে খেয়েছেন।

দম নিতেই একটু থেমে শিশির গলাটা আরো চড়িয়ে দিল তারপর —এটা কি পাতে খাবার ঘি?

না, পাতে, ভাতে, কি শুধু, কোন ভাবেই ও ঘৃত খাবার জিনিস নয়।

এ কার গলা? চমকে আমরা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছি আমাদের অনুমানে ভুল হয়নি। স্বয়ং ঘনাদাই—যেন ঘড়ি ধরে যথাসময়ে যথাস্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হয়েছেন।

আমরা যত খুশীই হই, শিশির তাঁকে দেখে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। শিশির রাগে প্রায় তোৎলা হয়ে উঠল—আপনি ...আপনি আবার মুখ দেখাতে এসেছেন এখানে! লজ্জা নেই আপনার! জানেন কি জিনিস আপনি নষ্ট করেছেন। জানেন আমার এই জীবন-মরণ সমস্যার প্রতিটি ফোঁটা যার অমৃত, সেই অমূল্য জিনিস আপনি ভাতে মেখে খেয়ে...

জুদশী!

কথার মাঝখানে ঘনাদার ওই বিদঘুটে উচ্চারণে আপনা থেকেই একবার থেমে যাবার পর, শিশির আরো গনগনে আগুনে হয়ে উঠল। —রাখুন রাখুন আপনার সব বুজরুকি। ওসব আমাদের ঢের দেখা আছে! আপনি...

হ্যাঁ, জুদশী!—ঘনাদা আবার গম্ভীর ভাবে বাধা দিলেন,—সব একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে!

কি জুদশী? কি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে,—এবার হল্কা-ছোটানো গলায় আমাদের জিজ্ঞাসাটাও প্রকাশ করলে।

কি মিলে যাচ্ছে? ঘনাদা স্থির ধীর ভাবেই জানালেন—মিলে যাচ্ছে তোমার যা হয়েছে তাই। নিদান বিধান সবই যাচ্ছে মিলে।

কি, আবোল-তাবোল বকছেন কি?—এবার শিশিরের সুর একটু পাল্টানো,—নিদান বিধান কোথায় কি মিলেছে?

ওই যে তোমাদের তখন শোনালাম,—ঘনাদা আমাদের স্মরণশক্তি একটু উস্কে দিলেন,—ওই যে সেনাপতি দিলেন জঙ্গলে দিশাহারা করে, মন্ত্রী কাটালেন আর শেষে স্বয়ং রাজা এসে জঙ্গল সুদ্ধ জ্বালিয়ে উনুন পাতিয়ে বসালেন। ব্যস্ রাস্তা খুলে গেল তাতেই।

এটা কি পাগলা গারদ পেয়েছেন!—শিশির আবার খাপ্পা হয়ে উঠল,—না, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত ভাতে মেখে খেয়ে আপনার ঘিলুটাই গেছে ঘণ্ট হয়ে?

আমার হয়ে যায়নি, কিন্তু তোমার তাই হত।

ঘনাদার এ নিষ্ঠুর টিপ্পনি শুনে শিশিরের শোক আবার উথলে উঠল,—আমার তাই হত! আমার প্রাণ বাঁচাতে স্বয়ং ধন্বন্তরীর মত কবিরাজ অত কষ্ট করে যা তৈরী করেছেন, আমার অনিষ্ট হত সেই ছাগলাদ্য ঘৃত খেয়ে?

হ্যাঁ হত,—ঘনাদা এতক্ষণে খাবারঘরের একটা চেয়ার টেনে জুৎ করে বসলেন,—কারণ ছাগ-টাগ ত নয়, তোমার ওই অমূল্য ঘৃতটি ছাগী দিয়ে তৈরী।

ছাগী দিয়ে তৈরী!—ঘনাদার এ ধানী লঙ্কা ফোড়নের টিপ্পনীতে শিশির মারমুখোর সঙ্গে একটু যেন কাঁদো কাঁদো—আপনি পাতে একবার খেয়েই বুঝতে পারলেন ঘি-টা ছাগলের নয় ছাগলীর?

হ্যাঁ পারলাম।—ঘনাদা করুণা করে বললেন,—যেমন বুঝতে পারছি তোমায় নিদান বিধান সব দিয়ে গেছে জুদশী!

ফের! ফের সেই জুদশী!—শিশির বুঝি শেষবার মেজাজ দেখাল,—কে? কে আপনার জুদশী?

কে নয়, বলো! কি!—ঘনাদা কৃপা করে তারপর বিশদ হলেন,—জন্দশী হল দুনিয়ার সব চেয়ে দামী সব চেয়ে বিরল, রোগ-চিকিৎসার গুপ্ত পুঁথি। জুদশীর মানে হল অষ্টাঙ্গ গুপ্ত বিদ্যার মৌল চতুর্সূত্র, চোদ্দ হাজার ছন্দে বাঁধা শ্লোকে তা লেখা।

সেই পুঁথি আপনার কাছে আছে?—এবার জিজ্ঞাসার ছলে উস্কানিটা অবশ্য আমাদের। খাবার টেবিলের দু' ধারে ঘনাদা আর শিশিরকে ঘিরে আমরা তখন বসে পড়েছি।

আমার কাছে ও পুঁথি?—ঘনাদা সত্যের মান রাখতে মহৎ হলেন,—জুদশীর একটিমাত্র গোটা পুঁথি আছে 'বুরিয়াতিয়া'-র উলান উদে শহরের লোক-সংস্কৃতি সংগ্রহশালায়।

সেই চোদ্দ হাজার শ্লোকের গোটা পুঁথিটি আপনি বুঝি পড়ে মুখস্থ করে রেখেছেন?—আমাদের বিস্ময় মেশানো সরল জিজ্ঞাসা।

পড়ে মুখস্থ করে রেখেছি!—সত্যের খাতিরে ঘনাদা আবার অকপট হলেন। একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন, সে পুঁথি পাবো কোথায় যে পড়ে মুখস্থ করব। সে পুঁথি আমি চোখেই দেখিনি এখনো।

তাহলে?—আমরা এবার একটু বিমূঢ়,—ও পুঁথির ত আর দ্বিতীয় কপি কোথাও নেই বলছেন!

তা ত নেই-ই।—ঘনাদা হেঁয়ালিটা আরো গভীর করলেন, আর একটি গোটা পুঁথি যোগাড় করবার জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমীর সাইবেরিয় শাখার একটি স্বতন্ত্র কমিটিই তৈরী হয়ে তিব্বত মঙ্গোলিয়া আর বুরিয়াতিয়ায় আপ্রাণ সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

তাতেও কিছু পাওয়া যায়নি?—আমরা সত্যিই খুব উদ্‌গ্রীব।

গেছে। আগের মতই এখানে ওখানে ছেঁড়াখোঁড়া এক-আধটা পাতা। ঘনাদা দুঃখের সঙ্গে জানালেন—অমন আরো কত পাতা মর্ম না বোঝার দরুণ যে লোকে হেলায় নষ্ট করেছে তার ঠিক নেই।

মর্ম না বুঝে নষ্ট করেছে ওই অমূল্য জিনিস!—আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ—কারা সেই আহাম্মক!

আহাম্মক তাদের বলা একটু অন্যায় হয়।—ঘনাদা তাঁর মহানুভবতায় আসামীদের পক্ষ নিলেন—হাতে পেলেও ও পুঁথির মর্ম বোঝা ত যার তার কাজ নয়। প্রথমতঃ পুঁথির পাতাগুলোই একেবারে অদ্ভুত। অনেকটা পুরোনো ফিল্ম নেগেটিভ-এর মত দেখতে কালো বার্নিশ করা কাগজে সোনালী রঙে লেখা। সে লেখাও বোঝার ক্ষমতা আছে ক'জনের। হয় প্রাচীন আলংকারিক ব্রাহ্মী লিপিতে,

নয় ওপর থেকে নিচে লাইন ধরে লেখা নিখুঁত আদি মঙ্গোলিয় হরফে ঠাসাঠাসি করে যা ওখানে লেখা তা একেবারে কঠিন ধাঁধা। সে ধাঁধা ভেদ করার বুদ্ধি না থাকলে কাগজগুলোর কোনো দামই নেই।

তাহলে?—শিশির তার আসল প্রশ্নটা এবার তুললে,—ওই একটি ছাড়া জুদশীর গোটা পুঁথি আর যখন নেই তখন আপনি জুদশী জুদশী করে অত আদিখ্যেতা করছেন কেন? আর নিদান বিধানই অত পাচ্ছেন কোথা থেকে?

কোথা থেকে পাচ্ছি?—ঘনাদা সব ধৃষ্টতা ক্ষমা করার হাসি হেসে বললেন,—পাচ্ছি খাঁটি জুদশী থেকেই। গোটা না থাক আর একটা কাটা-ছেঁড়া পুঁথি ছিল।

আরেকটা পুঁথি ছিল!—আমরা উৎসাহিত হতে গিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম,—কোথায় সে পুঁথি? আপনার কাছে ত নেই বললেন!

না, আমার কাছে নেই।—ঘনাদা অকপটভাবে স্বীকার করলেন, —তার কিছুটা আছে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোর খোটো-র যাদুঘরে আর বাকিটা স্পেনের সেভিলের এক ষাঁড়ের পেটে।

ষাঁড়ের পেটে—আমরা একটু সন্দেহ নিয়েই ঘনাদার দিকে চাইলাম। সন্দেহ ঘনাদার সত্যবাদিতায় নয়। তিনি তুচ্ছ সব সত্যের নাগালের বাইরে বলেই আমরা মেনে নিয়েছি। এবারের সন্দেহটা তাঁর সামলাবার ক্ষমতা সম্বন্ধে। এবার তিনি একটা কড়া ফরমাস নিজেকে দিয়ে ফেলেননি কি? মঙ্গোলিয়া-তিব্বত-বুরিয়াতিয়ার বিরলতম গুপ্ত পুঁথির খানিকটা সেভিলের ষাঁড়ের পেটে ঢুকিয়ে শেষ রক্ষা কি করতে পারবেন?

ঘনাদা কিন্তু অকুতোভয়। অর্ধনিমীলিত চোখে যেন সেই পুরোন স্মৃতির পাতায় তন্ময় হয়ে বললেন—হ্যাঁ, সেভিলের ষাঁড়, যেমন তেমন ষাঁড় নয়, আন্দালুসিয়ার অদ্বিতীয় ষণ্ড-বিশারদ ডিউক অফ ভেরাগুয়ার সেরা ভাকাদ্দা-র সবচেয়ে বড় ঘরাণার ষাঁড়। ও বাহাদুর বংশের ষাঁড়ের কীর্তি আর নাম-ডাক সেভিল স্পেন ছাড়িয়ে সেই দক্ষিণ আমেরিকায় পর্যন্ত ছড়ানো। ওই ভাকাদ্দার ছাপ দাগা জাত-ষাঁড়ের শিঙে তখনও পর্যন্ত হাজার হাজার পিকাডোর-এর ঘোড়া পেট দোফলা হয়ে খতম হয়েছে, 'চুলো' জান দিয়েছে অমন গন্ডা দশ, আর ব্যাণ্ডেলিয়েরো আর পিকাডোর দশ বিশটার ওপর খোদ এসপাদা বা মাটাডোর-ই ভবলীলা সাঙ্গ করেছে অন্ততঃ পাঁচ ছ'টি। প্লাজাস দে টোরোস-এর এই কংস-মার্কা বংশের এক বিভীষিকা...

এই পর্যন্ত বলেই ঘনাদা চোখ খুলে তাকিয়ে আমাদের অবস্থাটা অনুমান করেই বোধহয় থামলেন। তারপর জীবে দয়ার নীতি স্মরণ করে ব্যাখ্যা করে বললেন—ও, ঠিক কূল পাচ্ছ না বুঝি? তাহলে জেনে রাখো, প্লাজা দে টোরোস হল বুনো ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই-এর খেলা যেখানে হয় সেই চারদিক ঘেরা গোল রণাঙ্গন। এসপাদা বলে সবার ওপরের ষণ্ড-বীরকে ছোট একটি তলোয়ার আর রঙীন একটা নিশান নিয়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে যে শেষ পর্যন্ত ষাঁড়েদের খেলিয়ে তারপর খতম করে। পিকাডোর হল সওয়ারী বীর যারা লড়াই শুরু হবার পর ষাঁড়কে তাদের খাটো বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলে আর ব্যান্ডেলিয়েরো হল এসপাদাদের পরের ধাপের বীর যারা লাল দোলাই নেড়ে ষাঁড়কে খেলানো আর ক্ষেপানো থেকে তাদের গায়ে কাঁটা দেওয়া তীর বসিয়ে শেষ লড়াই-এর জন্যে তৈরী করবার সব কাজ করে।

ঘনাদা স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই-এর কুশীলব আমাদের চেনাবার মধ্যে একটু থামতেই শিবু যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে বললে—আপনি ষাঁড়ের লড়াই-এও তাহলে নেমেছেন?

কিন্তু ওই একটু তোয়াজের চেষ্টায় প্রায় হিতে বিপরীত হবার উপক্রম হবে কে জানত? যেন তাঁকে গালাগাল দেওয়া হয়েছে এমনি গরম হয়ে উঠে ঘনাদা বললেন—ষাঁড়ের লড়াই করব আমি! ওই একটা নিষ্ঠুর পৈশাচিক খেলার আমি হব একটা অংশীদার?

এ প্রশ্নের জবাব শিবুর ওপর খাপ্পা হয়েই দিতে হল।

শিবুটা একটা হাঁদারাম!—বললাম আমি।

শুধু হাঁদারাম!—গৌর তার ওপর আর এক পর্দা চড়ালে—ওটা আহাম্মক। নইলে অমন আজগুবী কথা ভাবে!

শিবুর চোখ মুখের চেহারা দেখে আমার আবার দু' দিকই সামলাতে হল। বললাম,—ওই যে আপনার জুদশীর খানিকটা ষাঁড়ের পেটে থেকে গেছে বললেন, তাইতেই ও ভেবেছে বোধ হয় যে আপনি ষাঁড়ের লড়াই করতেই ওখানে গিয়েছিলেন।

এরপর শিবুকে একটু জ্ঞান বণ্টন,—আরে খেলা দেখতে গেলেই কি খেলায় নামতে হয়। তাহলে ত ইস্ট-মোহন খেলার মাঠে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে যেত। সেভিলের ষাঁড়ের লড়াই-এর অত নাম-ডাক। ঘনাদা তাই দেখতে গিয়েছিলেন।

না, সে লড়াই দেখতেও যাইনি।—ঘনাদা এতেও আপত্তি জানালেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গের হাসিটা ক্ষমার—আমি গেছলাম চেয়াক

গাম্বোকে বাগে পেতে।

চেয়াক গাম্বো!—একটু আড়ষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে প্রশ্নটা আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল মুখ থেকে—সে আবার কে?

সে-ই হল সব নষ্টের মূল, শয়তান চূড়ামণি—তার কথা মনে করতেই ঘনাদার গলাটা যেন ঝাঁঝালো হয়ে উঠল—নামটা শুনে তাকে মঙ্গোলিয়ান মনে হয়, কিন্তু ওটা তার ছদ্মনাম। আসলে তার নিজের কোনো দেশই নেই। গুপ্তচরগিরি থেকে যে কাজে শয়তানী বুদ্ধি মোটা লাভে খাটানো যায়, এ সব কিছুর ধান্দায় যে দুনিয়াময় টহল দিয়ে বেড়ায়।

'জুদশী'র পুরোন পুঁথি খুঁজতে খুঁজতে টাকলা মাকানোর উত্তরে ঘোরাঘুরির সময়েই ওকে সঙ্গী হিসেবে নিয়েছিলাম। ও খুব করুণভাবে নিজের দুঃখের কাহিনী বলেছিল। মরুর ঝড়ে ও নাকি নিজের কাফিলা থেকে ছিটকে পড়ে তখন একেবারে অসহায় অবস্থায় পড়েছে। আমি সঙ্গে না নিলে সে এই মরুতে শুধু পিপাসাতেই শুকিয়ে মারা যাবে।

তার মুখ আর বিশেষ করে চোখের চাউনি দেখে তার আসল চরিত্র কিছুটা আন্দাজ করলেও, তার বিশাল দশাসই চেহারা আর এ অঞ্চল সম্বন্ধে বেশ কিছু জানা আছে দেখে সঙ্গে নিতে রাজী হয়েছিলাম।

গোড়ার দিকেই একদিন অবশ্য একটু শিক্ষা দিতেও হয়েছিল।

তখন আমার জুদশী পুঁথি সংগ্রহ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকটা পাতা শুধু বাকি। সে পাতাগুলো পাবার নয় জেনে আর ক'টা দিন মাত্র একটু চেষ্টা করেই পুঁথিটা উলান বাটোয় নিয়ে যাব বলে তখন ঠিক করে ফেলেছি।

ঠিক সেই সময়ে একদিন রাত্রে হঠাৎ কি একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে বিছানায় উঠে বসতে হল। উঠে বসে টর্চটা জ্বেলে অবাক হয়ে দেখি চেয়াক গাম্বো আমার তাঁবুতে ঢুকে আমার পিঠে বেঁধে চলার নিজস্ব ঝোলাটা হাঁটকাচ্ছে।

আমায় টর্চ জ্বেলে তাকে লক্ষ্য করতে দেখে বিন্দুমাত্র সে ঘাবড়াল না। যেমন ঝোলা হাঁটকাচ্ছিল তেমনি হাঁটকাতে হাঁটকাতে অম্লান বদনে বললে—আপনার তাঁবুতে একটা ইঁদুর ঢুকে কি কাটছে মনে হল। তাই একটু দেখতে ঢুকলাম।

খুব ভালো করেছ। টর্চটা জ্বেলে রেখেই বললাম,—তবে ভুল করেছ একটু। যেটা ইঁদুর ভেবেছ সেটা ইঁদুর নয়, ছুঁচো।

ততক্ষণে 'জুদশী'র পুঁথির লাল শালু মোড়া তাড়াটা সে বার

করে ফেলেছে। সেটা বগলদাবা করে ঝোলাটা ফেলে দিয়ে সে বললে, ইঁদুর নয় ছুঁচো ঢুকেছে বলছেন। তা হতে পারে। তবে সাবধানের বিনাশ নেই। পুঁথিটা এখন থেকে আমার কাছেই রাখা ঠিক করলাম।

তাই নাকি! খুব ভালো!—আমি খুশী হয়ে বললাম—একটা বড় দায় থেকে আমায় বাঁচালে!

আপনাকে আরো একটা দায় থেকে বাঁচিয়েছি। আমায় বাধিত করার সুরে বললে চেয়াক গাম্বো,—আপনাকে পিস্তল-টিস্তল আর ছুঁতে হবে না। বড় বেয়াড়া জিনিস কি না! কখন হাত ফস্কে কি হয়ে যায় তার ঠিক নেই। আপনার পিস্তলটা বালিশের তলা থেকে তাই আগেই সরিয়ে নিয়েছি।

শুধু পিস্তলটাই নিয়েছো ত আর...বলে হঠাৎ থেমে গেলাম থতমত খেয়ে।

আর—বলে থামলেন কেন?—গাম্বো ভুরু কুঁচকে একটু সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—কি, বলছিলেন কি!

না, ও কিছু নয়।—আমি যেন তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিতে চাইলাম।

গাম্বো কিন্তু নাছোড়বান্দা। গলা চড়ালেও বেশ অস্বস্তির সঙ্গে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কথা চাপবার চেষ্টা করবেন না। আর কি বলতে যাচ্ছিলেন বলে ফেলুন।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে যেন বাধ্য হয়েই একটু থেমে থেমে বললাম,—বলছিলাম যে, বালিশের তলার পিস্তলটাই শুধু নিয়েছ আর বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢোকানো বেরেটাটা...

ব্যস, ওইটুকুতেই কাম ফতে! বালিশের ওয়াড়ের ভেতর লুকোনো 'বেরেটা'-র নামে সেদিকে চাইতে গিয়ে দু সেকেণ্ডের একটু অন্যমনস্কতার মধ্যেই গাম্বো ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে তাঁবুর ধারে গিয়ে ঘাড়মুড় গুঁজে পড়ল। দু সেকেণ্ডের ফাঁকে কঙ ফুর একটি মোক্ষম লাথিতেই সে তখন ককাচ্ছে।

সেখান থেকে চুলের মুঠি ধরে তুলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম,—বলো, এবার কি বলার আছে এখন।

চেয়াক গাম্বোর সে কি কান্না তখন,—না, না, আমার আর কিছু বলবার নেই। আপনি আমায় কড়া শাস্তি দিন, কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এই শুধু আমার মিনতি।

তবু ক্ষমাই তাকে করলাম, আর বললাম, এরপর আর বেইমানি করার চেষ্টা করলে তাকে আরো নতুন 'বেরেটা' দেখিয়ে দেব।

বেইমানি সে তবুও করল। কখন কোন ফাঁকে আমার মুখ বাঁধা জলের থলেতে বাইরে থেকে মিহি ইনজেকশনের ছুঁচে বিষ ঢুকিয়ে আমায় অজ্ঞান করে ফেলে আমার জুদশীর পুঁথি নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল একদিন।

আমাকে অজ্ঞান করার পর একেবারে খতম করেই সে যেত, কিন্তু তখন দূরবীনে আরেক কাফিলাকে আমাদের তাঁবুর দিকেই আসতে দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যা পেয়েছে তাই নিয়েই আমার উটটি নিয়ে সে চম্পট দেয়।

অজানা কাফিলার লোকজন আসাতেই অবশ্য সে যাত্রা আমার প্রাণ বাঁচে, কিন্তু গাম্বো তখন একেবারে পগার পার।

তারপর ছটি মাস ধরে গাম্বোকে ধরবার জন্যে সারা দুনিয়া প্রায় চষে ফেলেছি বলা যায়। নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রানসিসকো, টোকিও থেকে লন্ডন, প্যারিস থেকে রিও দ্য ঝানেরো কোথাও খুঁজতে আর বাকি রাখিনি। হদিস কিন্তু কিছু মেলেনি।

ছ' মাসের মধ্যে জুদশীর চুরি করা পুঁথির কোনো ব্যবস্থা সে করতে পারেনি বলেই আমার তখন বিশ্বাস। তা সে করতে পেরে থাকলে জুদশীর মত দামী ও বিরল জিনিসের চোরা বাজারে একটু কানাঘুষা শোনা যেতই। সুতরাং গাম্বো যে কোথাও ঘাপটি মেরে থেকে সুযোগের অপেক্ষা করছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিয়ে সে এমন হাওয়া হয়ে গেল কি করে?

আমার মাথাতেও যা আসবে না এমন কোন মহলে সে নিশ্চয় গা-ঢাকা দিয়ে আছে। সে জায়গা কি রকম হতে পারে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ 'করিডা' মানে এই ষাঁড়ের লড়াই-এর জগতের কথা মনে পড়েছে। এ খেলা আমি ঘৃণা করি, তাই সে মহলে খোঁজ করার কথা আমি ভাবতেই পারিনি এতদিন।

ওই জগতটাই তাহলে এখুনি খুঁজে দেখা দরকার বুঝেছি। খোঁজা সফলও হয়েছে প্রথম চেষ্টাতেই। চেয়াক গাম্বো সেভিলের প্লাজা দে টোরোস মানে ষাঁড়ের লড়াই-এর ঘাঁটির মহলেই নিজেকে নিপাত্তা করে রেখেছে।

সন্ধান পেলেও তাকে বাগে পাবার মত সুযোগ সহজে মেলবার নয়। আমি একটু দূরে দূরে থেকে তার ওপর সব সময়ে নজর রাখি।

একটি বড় সুবিধের ব্যাপার এই যে, গাম্বো কোথায় তার চোরাই পুঁথি লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে বার করতে আমায় হয়রান হতে

হবে না। কখন কি অবস্থায় সরে পড়তে হবে ঠিক নেই বলে গাম্বো সে পুঁথি কখনো হাতছাড়া করে না। আমার সেই লাল শালু মোড়া বাণ্ডিলেই, সারাক্ষণ সেটি সঙ্গে নিয়ে ফেরে।

ষাঁড়ের লড়াই দেখা গাম্বোর এক প্রচণ্ড নেশা। প্লাজা দে টোরোস-এ যে কোন একটা লড়াই থাকলেই হল। সে একেবারে সামনের দামী সীটের টিকিট কিনে খেলা দেখবেই।

দূর থেকে তার সব চাল-চলন লক্ষ্য করে যে সুযোগ খুঁজছিলাম তাই একদিন আশাতীতভাবে এসে গেল।

বড় জবর ষাঁড়ের লড়াই-এর দিন সেটি। সারা স্পেনের সব চেয়ে খুনে ঘরানার সেরা একটি ষণ্ড 'টোরিল' মানে লড়াকু ষাঁড়েদের খাঁচা থেকে খেলার মাঠে বেরিয়ে এসেই একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে।

প্রথমে চার-চারটি পিকাডোরের ঘোড়ার পেট ফাঁসিয়ে খতম করার পর দুজন পিকাডোরকেই হাসপাতালে পাঠিয়ে সে তিন তিনজন ব্যাণ্ডেলিয়েরো আর জন পাঁচেক চুলো-কে আতঙ্কে মাঠছাড়া করেছে। তারপর স্বয়ং এসপাদা অর্থাৎ সবার ওপরের ষণ্ড বীরের যা অবস্থা করেছে, তা আর বলার নয়।

এ সাংঘাতিক ষাঁড় আবার শুধু শিং দিয়ে গুঁতোয় না, দাঁত দিয়ে কামড়ও দেয়।

সেরা এসপাদার সব জারিজুরি ভেঙ্গে সে ত দিয়েছে-ই, যে লাল রেশমী নিশান নাড়ার কেরামতিতে এসপাদা-রা ষাঁড়েদের নাচিয়ে খেলিয়ে ক্ষেপিয়ে হয়রান করে, সেই মুলেট্টাই কামড়ে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করেছে। মাটিতে ফেলে পায়ের ক্ষুরে দিয়েছে থেঁৎলে।

মানের দায়ে এসপাদাকে এবার মুলেট্টা ছাড়া শুধু এসতোক্ মানে খাটো তলোয়ার নিয়েই এসতোকাদা মানে মরণ-ঘা দেবার জন্যে এ সর্বনাশা ষাঁড়ের মহড়া নিতে হয়েছে।

কিন্তু এ ষাঁড় যেন স্বয়ং যমরাজের বাথান থেকে আমদানি মহাকালের বাহন। সেভিলের সেরা মাটাডোর, অমন পাঁচ-দশ গণ্ডা খুনে ষাঁড়কে একেবারে নিখুঁত 'এস্তোকাদা' মানে ঘাড়ের ঠিক পেছনে এক মোক্ষম মারে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত খাটো তলোয়ার গেঁথে দেওয়ার বাহাদুরিতে যে কাবার করেছে, তারই টিপ দিয়েছে ভণ্ডুল করে ওই সৃষ্টিছাড়া ষাঁড়। তারপর শিং-এর এক ঝাঁকানিতে এসপাদার হাতের এসতোক খসিয়ে তাকে প্রাণের দায়ে ছুটিয়েছে লড়াই-এর

ময়দানের ধারের এধরনের বিপদ ঠেকাবার বেড়ার ও-পারে।

সমস্ত প্লাজা দে টোরোস-এ তখন একেবারে হুলুস্থুল হৈ-রৈ কাণ্ড। এসপাদা-তাড়ানো সাক্ষাৎ মহাকালের বাহন দুই ধারালো শিং উঁচিয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আর চারদিকের দর্শকরাও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে যেন ক্ষ্যাপার মত চেঁচামেচি করছে।

এমন একটি মৌকা আমারও আশাতীত ছিল। দর্শকদের এই উন্মত্ত উত্তেজনার মধ্যে ওপরের আমার সস্তা টিকিটের গ্যালারি থেকে আমি অবাধে নেমে এসেছি নিচে একেবারে লড়াই-এর মাঠের ওপরেই ঝোলানো গাম্বোর দামী গ্যালারিতে।

সে তখন উত্তেজনায় দিশাহারা, আর সকলের মত হাত-পা ছুঁড়ে এসপাদাকে গাল দিয়ে ষাঁড়টাকে বাহবা দিচ্ছে।

বেশী কষ্ট করতে হয়নি। তার বগলের শালু মোড়া বাণ্ডিলটা একটু আলগাভাবেই ধরা ছিল। এই অবস্থায় ব্যবহার করবার জন্যে যে ম্যাজিক বড়িটা পকেটে এনেছিলাম সেটা মুখে দিতে হয়নি। এক হেঁচকা টানে সেটা কেড়ে নিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করেছি তারপর।

কিন্তু পালাব কোথায়? উত্তেজনায় উন্মত্ত দর্শকদের ভেতর দিয়ে পথ পাওয়াই শক্ত। এক মুহূর্তের জন্যে হকচাকিয়ে গিয়ে গাম্বো তখন চিৎকার করতে করতে আমার পেছনে তাড়া করেছে। একা তার হাত থেকে পালানো হয়ত শক্ত হত না। কিন্তু পেছনে সে আর সামনে ওপরে চেয়ে দেখি তারই ভাড়াটে পাহারাদার ক'জন যমদূতের মত আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

এ সংকটে একমাত্র যা করবার তাই করতে হল।

কি করলেন আপনি? ধরা দিলেন? ঘনাদা দম নিতে একটু থামবার পর শিশিরেরই প্রথম উদ্বিগ্ন প্রশ্নে হাওয়া একটু ঘুরছে বলেই আশা হল।

না, না, ধরা দেবেন কি?—চাকাটা চালু রাখলাম আমি, ঘনাদা ওই যে কি বড়ির কথা বলছিলেন সেইটি বোমার মত ছাড়লেন।

যেমন তুমি আহাম্মক!—শিবু খিঁচিয়ে উঠল,—সে ত মুখে দেবার বড়ি! মুখে দেবার বড়ি কখনো বোমা হয়?

ওসব কিছু নয়,—গৌর পরম বিজ্ঞের মত বললে,—ঘনাদা একমাত্র যা ওই অবস্থায় করা যায় তাই করলেন। অর্থাৎ লাল শালুর পুঁটলিটি ফেরত দিলেন গাম্বোকে। গাম্বোর হদিস যখন মিলেছে তখন একদিন তার হাত থেকে ও বাণ্ডিল উদ্ধার করবার সুযোগ

হবেই। তার জন্যে বেফায়দা বেঘোরে প্রাণটা ত আর দেওয়া যায় না। তাই না ঘনাদা?

না।—ঘনাদা সত্যের খাতিরে যেন বলতে বাধ্য হলেন,—যা বললে তার কোনটাই নয়। ওই বাণ্ডিল নিয়ে নিচের অ্যারিনাতেই লাফিয়ে পড়লাম।

লাফ দিলেন নিচে! আমরা স্তম্ভিত।

ওই সাক্ষাৎ শমন যেখানে শিং বাগিয়ে ওৎ পেতে আছে সেই-খানে?—আমাদের গলা যেন বুজে আসছে আতঙ্কে।

হ্যাঁ,—নিরুপায় ভঙ্গিতে বললেন ঘনাদা,—সেই শিং বাগানো শমনের কোটের মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। সমস্ত প্লাজা দে টোরোস তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায় উল্লাসে। চিৎকার করে রুমাল স্কার্ফ নেড়ে চারদিক থেকে সবাই আমায় উৎসাহ দিচ্ছে। কেউ ফ্রানসিসকো রোমেরো-র নাম করছে, কেউ এল সিড বলে চেঁচিয়ে ডন রোডরিগো দিয়াজ দে ভাইভার-এর পুরো নামটাই উচ্চারণ করছে।

আমার হাতে শুধু ওই লাল শালুর বাণ্ডিল ছাড়া বল্লম কি এস্তোক কিছুই নেই। কিন্তু সে ভাবনা আমায় ভাবতে দিলে না গোটা প্লাজা দে টোরোসের দর্শকেরা। মুহূর্তের মধ্যে ঝপ ঝপ করে চারদিক থেকে অমন গোটা দশেক বল্লম আর খাটো তলোয়ার আমার সামনে এসে পড়ল।

ষাঁড়টা তখন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে আগুনের হল্কার মত নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ফেনা-মাখানো মুখে আমার দিকে চেয়ে পায়ের ক্ষুর মাটিতে ঠুকছে।

ক'বার অমনি পা ঠুকেই শিং বাগিয়ে মেল ট্রেনের মতই সে ছুটে এল আমার দিকে।

ঘনাদা আবার একটু থামলেন।

কি করলেন তখন?—আমাদের মধ্যে শিশিরই সব চেয়ে উদ্‌গ্রীব। ওই এস্তোক না যা হোক একটা তুলে নিলেন ত?

না।—সত্যাশ্রয়ী ঘনাদা যেন বাধ্য হয়েই স্বীকার করলেন,—এস্তোক কি বল্লম কিছুই তুললাম না। ও গোহত্যা আমার কাজ নয়।

তাহলে?—আমরা উৎকণ্ঠিত।

গাম্বোর জন্যে আনা সেই গুলিটা পকেট থেকে বার করে মুখে দিলাম। ষাঁড়টা তখন একেবারে সামনে এসে বাগানো শিং জোড়া তুলতে যাচ্ছে। তার মুখের ওপর বুকের সমস্ত নিশ্বাস জমা করে সজোরে দিলাম এক ফুঁ!

ফুঁ দিলেন!—আমাদের চোখ ছানাবড়া।

হ্যাঁ, শুধু ফুঁ—সবিনয়ে বললেন ঘনাদা—ব্যস্ তাইতেই ধেই নৃত্য করতে করতে মাটিতে মুখ ঘসবার চেষ্টায় তার কি আছাড়ি-পিছাড়ি। আমার ভয়ের আর তখন কিছু নেই, কিন্তু শিং বাগিয়ে চড়াও হবার পর আমার ফুঁ দেবার আগেই আমার লাল শালুর বাণ্ডিলের এক খাবলা সে যে কামড়ে তুলে নিয়েছে।

সমস্ত অ্যারিনার লোক যেন তখন পাগল হয়ে গিয়েছে উত্তেজনায়। ষাঁড়ের খাবলানো পুঁথির ভাগ আর উদ্ধার করবার নয় বুঝে যেটুকু পেরেছি তাই নিয়েই আমি সেই হট্টগোলের মধ্যে সরে পড়বার পথ খুঁজছি।

প্লাজার আর কেউ তা গ্রাহ্য না করুক, চেয়াক গাম্বো তাতে চুপ করে থাকতে পারে! মরিয়া হয়ে আমায় ধরবার জন্যে সে-ও লাফিয়ে পড়েছে লড়াই-এর মাঠে।

আর তাতেই হয়েছে সর্বনাশ। মাটিতে নাক-মুখ ঘসবার চেষ্টা করেই ষাঁড়টা আমার ফুঁ-এর ধাক্কা খানিকটা তখন সামলে উঠেছে। গাম্বোকে ওভাবে লাফিয়ে পড়তে দেখে সে একেবারে প্রলয়ের বাহন।

একটা ছুট, একটা চিৎকার আর সেই সঙ্গে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় শিংয়ের গুঁতো।

প্লাজা ভর্তি সমস্ত দর্শকই তখন দিশাহারা হলেও কর্তব্যে ত্রুটি কর্তাদের হয়নি। ওই হট্টগোলের মাঝে অ্যাম্বুলেন্সকে গাম্বোর দিকে ছুটে যেতে দেখে তুমুল গোলমালের সুযোগে মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছি। 'জুদশীর' পুঁথির অনেকখানিই সেই খুনে ষাঁড়ের পেটে গেছে, কিন্তু যা বেঁচেছে তাও বড় কম নয়। সেই অমূল্য জিনিস নিজের কাছে আর রাখিনি। যে মুল্লুকের জিনিস, সেই মঙ্গোলিয়ার উলানবাটোরে নিয়ে সবটাই জমা করে দিয়ে এসেছি।

তাহলে? শিশিরকে একটু বেশী ভাবিত মনে হল,—সে জুদশী ত এখন নাগালের বাইরে। আপনি ত ভালো করে পড়েও দেখেননি।

তা কি আর দেখিনি—ঘনাদা শিশিরের ভুল ভাঙলেন।

পড়েছেন!—শিশির অত্যন্ত উৎফুল্ল,—কিন্তু যা পড়েছেন তা কি আর মনে আছে?

মনে থাকবে না কেন?—ঘনাদা যেন এরকম সন্দেহে অপমানিত—গোটা পুঁথিতে চোদ্দ হাজার আর আমার ওই ছেঁড়াটায় ন'হাজার শ্লোক মাত্র।

মাত্র ন'হাজার—ঘনাদার স্মৃতিশক্তির এই যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনে আমাদের মুহ্যমান গলা দিয়ে ওই বিহ্বল উচ্চারণটুকু বার হল।

হ্যাঁ, ন'হাজারের বেশী নয়।—ঘনাদা একটু বিশদ হলেন,—তবে মানে না বুঝে শুধু মুখস্থ করে লাভ কি? সেই মানে বোঝাই দায়।—

কেন? কেন?—আমাদের ব্যাকুল প্রশ্ন,—ভাষা খুব শক্ত বুঝি?

ভাষা ত বটেই তার চেয়ে বেশী কঠিন ভাব।—ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—সব জটিল ধাঁধায় লেখা কি না।

সব ধাঁধায় লেখা—আমাদের বিস্মিত কৌতূহল!

কি রকম ধাঁধা শুনবে—ঘনাদা সদয় হয়ে উদাহরণ দিলেন,—এই একটা শোলোক গদ্যে বলছি শোনো—

—খারাপ আওয়াজের রোগ। তার জন্যে সেনাপতির কাছে যেতে তিনি দিলেন 'লুক মিক্'। রোগ কিন্তু সারল না। তখন চাবুক হাতে রাজা যেই এসে দাঁড়ালেন অমনি রোগ গেল পালিয়ে।

এই আপনার জুদশীর ধাঁধার নমুনা?—হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল,—এ ধাঁধার আবার মানে আছে!

তা আছে বইকি—ঘনাদা আমাদের অজ্ঞানতিমির ঘোচালেন,—রোগটা হল বাচ্চাদের চোখ দিয়ে জল পড়া। বুরিয়াতিয়া কি মঙ্গোলিয়ায় ও রোগ বোঝাবার শব্দটা বেশ বিদঘুটে। তাই তাকে বলা হয়েছে খারাপ আওয়াজের রোগ। আর 'লুক মিক' হল ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়ানো পাপড়ীর তিব্বতী এক জাতের চন্দ্রমল্লিকা। বাচ্চাদের চোখের জল পড়া ওই চন্দ্রমল্লিকার পাপড়ীর রস দিলে সারে। তবে সঙ্গে কড়া অনুপান চাই। সেনাপতি শুধু লুক মিক-ই বিধান দিয়েছেন। তাতে সারেনি, কিন্তু চাবুক হাতে রাজা মানে আরো কড়া অনুপান মেশাতেই ওষুধ অব্যর্থ হয়ে গেল।

তাহলে—আমরা বিহ্বলভাবে জানতে চাইলাম,—শিশিরের অসুখের কথায় সেদিন ধাঁধা মত যা শুনিয়েছিলেন তা আপনার ওই জুদশী থেকেই নেওয়া? শিশিরের রোগের নিদান-বিধান ওরই মধ্যে লুকোন আছে?

তা আছে বই কি!—বলে ঘনাদার উঠবার উপক্রম দেখে শিশিরই তাঁকে সবচেয়ে ব্যস্ত হয়ে থামিয়ে প্রথম মিনতি জানালে,—ও ধাঁধাটার যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

ব্যাখ্যা করতে বলছ—ঘনাদা কেমন একটু উসখুস করে এদিক ওদিক চেয়ে বললেন,—কিন্তু কি জানো...

ঘনাদাকে তাঁর বাক্যটি আর শেষ করতে হল না। শিশিরই তার আগে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে বললে—একটু বসুন! আমি এখুনি আপনার সিগারেট আনছি। এই যাব আর আসব।

শিশির তখুনি এক লাফে ঘরের বাইরে।

শোনো! শোনো! ঘনাদা পিছু ডাকলেন,—সিগারেট ত আনছ সেই সঙ্গে তোমার ওই কি চিকিচ্ছের বই, কি বারিধি না কি সেটাও নিয়ে এসো একবার।

সেটাও আনব!—শিশির একটু অবাক হয়েই ওপরে চলে গেল। আমরাও তাই।

শিশিরের সিগারেট আনতে দেরি হল না। প্যাকেট-ট্যাকেট নয়, একেবারে আনকোরা সিগারেটের টিন। অসুখের বাতিকে খাওয়া ছেড়ে দিলেও ঘর থেকে বিদেয় করতে পারেনি। টিনের সঙ্গে বৃহৎ চিকিৎসা বারিধি বইটাও শিশির এনেছে।

শিশির যথারীতি সিগারেটটা ধরিয়ে দেবার পর মৌজ করে দুটো রাম টান দিয়ে শিশিরের বইটা একটু নাড়তে নাড়তে ঘনাদা তাঁর ধাঁধার ব্যাখ্যা শোনালেন নাটকীয়ভাবে।

—ধাঁধাটা কি? সেনাপতি ঘোর জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিয়ে দিলেন পথ হারিয়ে, মন্ত্রী খুঁজে খুঁজে গাছ কাটালেন ভোঁতা কুড়ুলে। তাতে শুধু বদগন্ধই ছড়াল, কাজ হল না কিছু। তখন রাজা এসে জঙ্গল জ্বালিয়ে উনুনে বসাতেই সব সমস্যা মিটে গেল।

—এ ধাঁধার মোদ্দা মানে শুধু এই যে তোমার যা রোগ এখন তাতে সেঁক নেওয়া দরকার।

সেঁক? কিসের সেঁক?—আমাদের সকলেরই হতভম্ব প্রশ্ন।

রাজা যা জ্বালিয়ে উনুনে বসালেন সেই জঙ্গলের মত গোলমেলে মস্ত প্রকাণ্ড কিছুর।—ঘনাদা বোঝালেন,—যে জঙ্গলে ঢুকে ব্যাধি সুরু, ছাড়া-ছাড়া ভাবে সামলাতে গিয়ে যা রোগ বাড়িয়েই দিয়েছে, সেই গোটা জঙ্গলই চেলাকাঠ করে উনুনে দিয়ে তার সেঁক নিতে হবে। পারবে তা নিতে?

প্রশ্নটা শিশিরকে করলেও আমরা সবাই নিজেদের সম্মতি আর উৎসাহ জানালাম—পারবে না মানে! নিশ্চয়ই পারতে হবে। এতবড় রোগ বলে কথা!

কিন্তু সেঁকটা নেব কি জ্বালিয়ে?—শিশিরের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

কি জ্বালিয়ে নেবে? দাঁড়াও, দাঁড়াও—ঘনাদা যেন তৎক্ষণাৎ আকাশ-পাতাল সব খুঁজে নিয়ে বললেন,—একটা খুব মোটা ঢাউস

বই হলে হয়। বই মানেই ত জঙ্গল। তা তোমার এই বৃহৎ চিকিৎসা বারিধিটাই সব চেয়ে ভালো।

ওই বই! শিশির আপনা থেকেই একটু শিউরে উঠে বললে, কিন্তু ও বই যে...

কিন্তু-টিন্তু কিছু নয়,—ঘনাদা তাকে প্রায় ধমকে থামিয়ে দিলেন, —ওই বই। তোমার জঙ্গল। ভালো চাও ত পুড়িয়ে সেঁক নাও আজই।

ঘনাদা আর এ ঘরে থাকলেন না। গট গট করে ওপরে নিজের টঙের ঘরে চলে গেলেন, শিশিরের সিগারেটের টিনটা অবশ্য সঙ্গে নিয়ে।

শিশির সেদিকে চেয়ে একটু দ্বিধাভাবে বললে,—আচ্ছা এটা কি সত্যি ওই জুদশীর বিধান?

আলবৎ জুদশীর বিধান!—আমরা সমস্বরে তাকে আশ্বস্ত করলাম,—ধাঁধার নমুনা দেখেই বুঝতে পারলি না, একেবারে খাঁটি নির্ভেজাল 'জুদশী'!

*　　*　　*

জুদশীর বিধান অব্যর্থ। শিশিরের সব রোগ সেরে গিয়েছে।

পুঃ—ঘনাদার মারাত্মক ফুঁ-এর ম্যাজিক বড়িটা কিসের, সে রহস্যভেদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। ঘনাদাকে আড্ডাঘরে পেয়ে সেদিন আমি বলেছি,—ওটা বড়ি নয়, ক্যাপসুল। আমোনিয়া কার-বোনেট, মানে স্মেলিং সল্টে ভরা। ঘনাদা মুখে নিয়ে দাঁতে কেটে বলীবর্দের মুখে ফুঁ দিয়ে ওটা ছিটিয়েছেন।

না,—শিবু আমার থিওরী নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে,—ওটা ক্যাপ-সুল তবে স্মেলিং সল্ট-টল্ট নয়। শুকনো ধানী লঙ্কার গুঁড়োয় ভরা। না ঘনাদা?

ঘনাদা জবাব না দিয়ে ঈষৎ হেসে তাঁর টঙের ঘরের দিকে চলে গেছেন।

ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ পাবার পর গৌর বলেছে,—ও সব কিচ্ছু নয়, স্রেফ হ্যালিটোসিস্।

ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে

ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে! সে আবার কি?

শুনে হাসি পাচ্ছে ত? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না? কাঠবিড়ালীরাও যেমন কাজে লেগেছিল, ভারত-যুদ্ধে মানে কুরুক্ষেত্রের সেই মহা-যুদ্ধে পিঁপড়েদের সেইরকম কোনো মদৎ ছিল বলে মনে হচ্ছে হয়ত।

না, সরাসরি ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়েদের কোন পার্ট ছিল বলে জানা নেই।

তবে,—যাক, বলেই ফেলা যাক—পিঁপড়েদের—না, বহুবচনটা ভুল, আসলে—একটি ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে তার কেরামতিটুকু না দেখালে ভারত-যুদ্ধের প্রামাণিক ইতিহাসে ওই পাঁচ লহমার ফাঁক মানে ফাঁকিটুকু থাকত না।

ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে! তার কেরামতিতে ভারত-যুদ্ধের ইতিহাসে ফাঁক?

—কেরামতিটা কি?

তা বোঝাবার জন্যে গোড়া থেকে সুরু করা উচিত। একেবারে বাহাত্তর নম্বরের সেই দোতলার আড্ডাঘরে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সুরু এক রবিবারের গুমোট সকালবেলায়।

কাগজে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিয়েছেঃ—সারাদিন ভ্যাপসা গরম,—বিকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কাগজে ত' হপ্তাভোর রোজই ওই ভাঁওতা দিচ্ছে। কিন্তু সব ভরসাই ফরসা। না আকাশ, না টঙের ঘর থেকে এক ছিটেফোঁটা বর্ষণের লক্ষণ পাচ্ছি।

আকাশে কি টঙের ঘরে বজ্র-বিদ্যুৎ অবশ্য নেই। কিন্তু তাতেই ত' আরো জ্বালা।

বজ্রবিদ্যুতের জায়গায় দু-বেলা কোকিলের বদলে দাঁড়কাক-গিলে-খাওয়া গলার অমৃতসমান মহাভারতের কথা শুনছি।

কখনো— গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে॥
তিল অর্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যার নিঃশ্বাসে প্রলয়॥

কখনো বা—

অশ্বথামা নামে হস্তী তার তুল্য অন্য নাস্তি
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে তিনি জলধর, ঈষা সম দন্ত সর
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু অধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, রোষযুক্ত নৃপবর
ভীমসেন করিতে সমর।

গলাটি কার তা আর বলে দিতে হবে না নিশ্চয়।

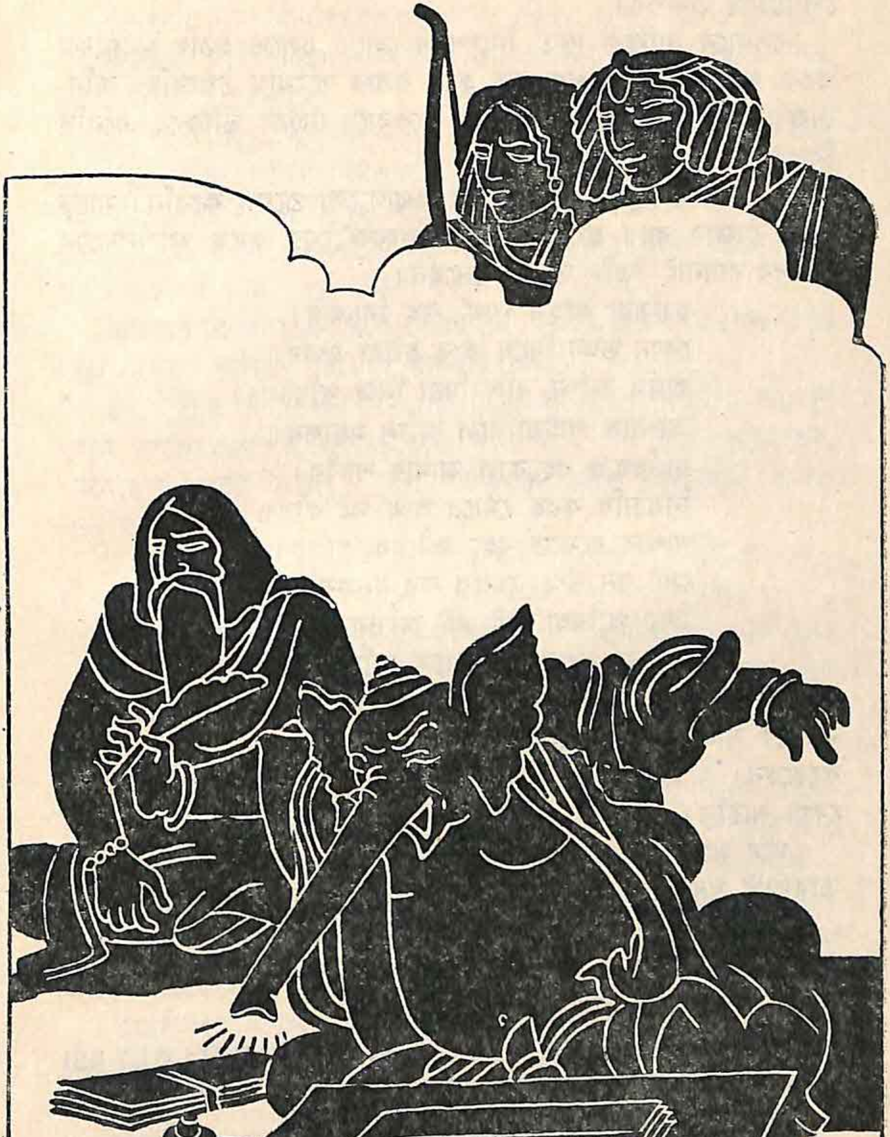
হ্যাঁ, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ তেতালার টঙের ঘরে তিনি কিছু-দিন ধরে আর সব ছেড়ে মহাভারত ধরেছেন। আমরাও সেই সঙ্গে পথে বসেছি।

সময়ে অসময়ে তাঁর নিজস্ব ট্রেডমার্ক-মারা গলায় ওপর থেকে কাশীরাম দাসের পয়ার ভেসে আসে। সে পয়ারের ঢেউ ঠেলে কোনরকমে যদি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছোই তিনি যেন মহাভারতের অমৃতরসে ডুবে আমাদের দেখতেই পান না।

তাঁর মতিগতি একটু ফেরাবার আশায় স্বস্ত্যয়নের উপচার যোগাতে আমরা কিছু ত্রুটি করিনি এ পর্যন্ত। কখনো আমিষ কখনো নিরামিষ, সাত্ত্বিক বা তামসিক বেশ কিছু আমাদের সমভি-ব্যাহারে গিয়েছে।

নৈবেদ্য সামনে ধরে দিয়ে আমরা একান্ত বশংবদ হয়ে এধারে ওধারে বসেছি। তাঁর শূন্য দৃষ্টি দু-একবার আমাদের দিকে ফিরলেও এ স্থূল বর্তমান ভেদ করে সেই সুদূর হস্তিনাপুরেই বোধ হয় চলে গেছে। আমরা যে তাঁর গোচরীভূত তার কোনো প্রমাণ পাইনি।

শুধু দক্ষিণ হস্তটা তাঁর নিজের অজান্তেই প্লেটের প্রত্যক্ষ বর্তমানের ওপর প্রসারিত হয়েছে। অচেতনভাবেই মুখে গিয়ে



পৌঁছেছে তারপর।

সেখানে যান্ত্রিক দন্ত নিষ্পেষণ চলতে চলতে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে থামায় আমরা শশব্যস্ত হয়ে বলার সুযোগ পেয়েছি—কবিরাজীটা কি জুৎ হয়নি ঘনাদা? একেবারে টাটকা ভাজিয়ে এনেছি কিন্তু!

ঘনাদার কর্ণকুহরেই বোধ হয় কথাগুলো প্রবেশ করেনি। সাড়ে তিন হাজার বছর ছাড়িয়ে গিয়ে কৃষ্ণার্জুনের কাছে অগ্নিদেবের ক্ষিদের বায়নাই তিনি তখন শুনছেন।

হাসিয়া কহেন পার্থ, কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এক্ষণ॥
আমি অগ্নি, বলি দিয়া নিজ পরিচয়।
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর॥
খান্ডব বনেতে বহু জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে কর ধনঞ্জয়॥
উদর পূরিয়া খাই এই অভিরুচি।
কোনো পশুপক্ষী মৎসে নাহিক অরুচি॥

অগ্নিদেবের ক্ষিদের আবদার শোনাতে শোনাতে খান্ডব বনের অভাবে সামনে ধরে দেওয়া প্লেটগুলো ঘনাদা চেটে পুটে সাবাড় করেছেন। আমাদের উপস্থিতি টের পাবার কোনও লক্ষণই কিন্তু দেখা যায়নি।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে নিচে নেমে এসেছি সবাই। আর তারপরই ঘনাদাকে কাৎ করবার এই নতুন মতলব ভাঁজা হয়েছে।

ফন্দিটা বিষে বিষক্ষয়, মানে যাকে বলে অটোভ্যাক্সিন। যা দিয়ে আমাদের জ্বালাচ্ছেন তাই দিয়ে ঘনাদাকে জব্দ করাই অর্থাৎ তাঁর ওপরই মহাভারত চাপানো।

সকাল থেকেই আমাদের তর্কটা সুরু হয়েছে। ঘণ্টার কাঁটা ছটা থেকে সাতটার দিকে যত এগিয়েছে আমাদের গলা ধাপে ধাপে তত তেতালার টঙ পর্যন্ত পৌঁছেছে নিশ্চয়।

একদিকে শিবু আর আমি অন্য দিকে গৌর আর শিশির।

তর্ক ত' নয় যেন দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র।

ছটা একুত্রিশে শিবুর হাঁক ন্যাড়া সিঁড়িটা বোধহয় পেরিয়ে গেছে, —আলবৎ হারত পান্ডবেরা।

কখখনো না!—শিশিরের প্রতিবাদ খোলা ছাদ পর্যন্ত নিশ্চয়।

কচুকাটা হত তাহলে!—আমি গলাটা টঙের ঘরে পর্যন্ত পেঁছে দিতে পেরেছি বোধহয়।

ওপরে ঘনাদার সুরেলা মহাভারত শোলোক আওড়ান হঠাৎ যেন থেমেছে। এই 'জিরো আওয়ার' বুঝে নিজেদের গলার পেছনে আমরাও এবার ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে টঙের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি। পেছন দিকে তাকিয়ে খাবারের ট্রে সমেত বনোয়ারী ঠিক হিসেব মত হাজির হবার জন্য তৈরী কিনা দেখে নিতে ভুলিনি।

তারপর টঙের ঘরে গিয়ে দোতালার তর্কটা একেবারে যেন তপ্ত খোলা থেকে নামিয়ে দিয়েছি ঘনাদার সামনে।

গৌর প্রায় বিধানসভার মেজাজ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঘনাদার কাছে স্পীকারের রুলিং চেয়েছে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—শুনেছেন, শুনেছেন এদের কথা! বলে পান্ডবরা নাকি গোহারান হারত কুরুক্ষেত্রে!

হারতই ত'—শিবু তাল ঠুকেছে ঘনাদার তক্তপোষটাই চাপড়ে—দুর্যোধন অমন গবেট না হলে তুলোধোনা হত পান্ডবেরা।

তুলোধোনা হত পান্ডবেরা!—শিশির আর গৌর যেন অর্জুনের গান্ডীব আর ভীমের গদা-ই হাতে নিয়ে হুঙ্কার দিয়েছে—কে তুলোধোনা করত, কে? দুর্যোধনের নিরানব্বই-এর বদলে আরো ন'শ নিরানব্বইটা ভাই থাকলেও, তাতে কুলোত না।

দুর্যোধনের ভাইদের আবার ডাকা কেন?—আমি গলায় একেবারে লঙ্কাবাটা মাখিয়ে বলেছি,—তাদের মাঠে নামবার দরকার হত না। গ্যালারিতে বসেই তারা ফাইন্যাল দেখতে পেত। দেখত কর্ণ—হ্যাঁ একা সূতপুত্র কর্ণ কেমন করে কুরুক্ষেত্রের কাঁকুরে মাটিতে পাঁচ ভাই পান্ডবের নাকগুলো ঘসে দেয়। নেহাৎ দুর্যোধন নিজের আহাম্মকীতে রেফারীকেই খচিয়ে দিলে তাই।

কথাগুলো বলতে বলতে আড়চোখে ঘনাদার দিকে অবশ্য নজর রেখেছি। এত পাঁয়তাড়া যে জন্যে কষা সে মতলব একটু হাসিল হচ্ছে কি?

কোথায়—

ঘনাদা তাঁর কাশীরাম দাসের বিরাট গন্ধমাদনটি সামনে খুলে ধরে শোলোক আওড়ানো থামিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে যেন তাঁর এই টঙের ঘরেই আর নেই। দেহটা শুধু ফেলে রেখে কুরুক্ষেত্রেই বুঝি চরতে গেছেন।

তা গেছেন যান। ফিরতে যাতে হয়, তার জন্য নারাচ, নালিক, পাশুপত থেকে ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত সবরকম অস্ত্রের ব্যবস্থা না করে আজ আমরা আসিনি।

দু' এক সেকেণ্ডের ফাঁক যা পড়েছিল রেফারী কথাটার খেই ধরে তা ঢেকে গৌর খিঁচিয়ে উঠল—রেফারী! রেফারী আবার কে?

রেফারী কে জানো না!—সঙ্গে সঙ্গে শিবুর টিটকিরি আর আমার নব মহাভারত পাঠ শুরু।

শিশির আর গৌরের দিকে চেয়ে কানমলা দেওয়া গলায় বললাম, —মহাভারতটাও পড়িসনি! শোন তাহলে—

মহাভারতের কথা কি কহিব আর।
কি হলে যে কি হইত অন্ত পাওয়া ভার॥
দুর্যোধন দুর্ভাগার মতিচ্ছন্ন হইল।
পদতল ছাড়িয়া বুদ্ধু শিয়রে বসিল॥
তাই না চটে চতুর কৃষ্ণ গাড়োয়ান হইয়া।
পান্ডু বয়েজ টীমকে দিলেন ম্যাচটা জিতাইয়া॥
চালের ভুলে রুষ্ট যদি না হতেন রেফারী।
কুরুক্ষেত্রে যায় কুরুরা পেনাল্টিতে হারি?॥

ঘনাদার দিকে চোখ রেখেই পদগুলো আওড়াচ্ছিলাম, কিন্তু শুভলক্ষণ কিছু দেখলাম না। ঠিক কুরুক্ষেত্রে না থাকলেও এখনও হস্তিনাপুর ছেড়ে তিনি আসতে প্রস্তুত নন মনে হল।

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিটে বনোয়ারী তখন ঘরে ঢুকে ঘনাদার সামনে খাস্তার কচুরি আর অমৃতির প্লেট দুটো ট্রে থেকে নামিয়ে রাখছে।

ঘনাদার মুখের ভাব দেখে মনে হল এবারে তাঁর হস্তিনাপুরের প্রবাস থেকেই তিনি আনমনে সে প্লেটে হাত বাড়াতে দেরী করবেন না।

ব্রহ্মাস্ত্রটা চটপট তাই প্রয়োগ করতে হল এবার।

ঘনাদার লুব্ধ হাত প্লেটে এসে পৌঁছোবার আগেই দুদিক থেকে গৌর ও শিবু চক্ষের নিমেষে দুটি প্লেট তুলে নিয়ে বনোয়ারীকে ধমকে উঠল—কি, হচ্ছে কি এসব! যখন তখন খাবার দিলেই হল! এখন এসব কে আনতে বলেছে!

বনোয়ারী অভিনেতা নয়। আগে থাকতে অনেক শেখানো পড়ানো সত্ত্বেও গৌর শিবুর ধমক খেয়ে সে সব ভুলে তোতলা হয়ে

গিয়ে দুবার শুধু 'হামি হা...মি...ত' গোছের কিছু একটা উচ্চারণ করল। আমাদের মতলব হাসিলের পক্ষে তাই কিন্তু যথেষ্ট।

ঘনাদার মুখের চেহারাটা তখন সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার হস্তিনাপুর থেকে এক ঝটকায় উনিশশ' পঁচাত্তরের বাহাত্তর নম্বরে এসে পড়ার জন্যেই বোধহয় বেশ একটু ভ্যাবাচাকা।

আর যাই হোক এরকম একটা অবস্থার কথা তিনি কল্পনা করতেই পারবেন না জেনে মতলবটা ভাঁজা হয়েছিল।

কচুরি অমৃতির প্লেট দুটো বনোয়ারীর ট্রেতে তুলে তাকে চলে যাবার হুকুম দেওয়ার সঙ্গেই কাজ যা হবার হল।

ঘনাদা অবশ্য এইটুকুর মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সেই ভ্যাবাচাকা ভাবটা মুখ থেকে মুছে এতক্ষণে যেন আমাদের সম্বন্ধে সচেতন আর বনোয়ারীর প্রতি করুণাময় হয়ে উঠলেন,—আহা বেচারাকে মিছে কষ্ট দেওয়া কেন? আবার ত' সেই আনতেই হবে ওকে!

ওগুলো রেখে যেতেই বলছেন!—আমাদের গলায় একটু মৃদু প্রতিবাদের সুরই ফোটালাম—কিন্তু আমাদের জরুরী কথাগুলো...

কি তোমাদের জরুরী কথা বলো না!—ঘনাদা বনোয়ারীর হাত থেকে পুরো ট্রেটা একরকম কেড়ে নামিয়ে নিলেন—এগুলোর ত' আর গলা নেই যে গোলমাল করবে। বলে ফেলো কি তোমাদের জরুরী কথা!

ঘনাদার শেষ কথাগুলো মুখে ঠাসা কচুরি ভেদ করে একটু জড়ানো অবস্থাতেই বার হল। আবার পাছে মুখের গ্রাস ফসকে যায় এই ভয়ে তিনি তখন প্রায় দুহাতে কচুরি আর অমৃতি মুখে বোঝাই করছেন।

তা যা করেন করুন। আমরা এতদিনে তাঁকে বাগে পেয়েই খুশি। বেশ একটু জমিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলাম,—জরুরী কথাটা কি, তা এখনো বোঝেননি? শুনুন না ওই আহাম্মকদের কথা। বলে কিনা কৌরবরা কিছুতে হারত না!

আহাম্মকেরা মানে শিশির গৌর। তারাও ঠিক সিনেরিও মাফিক ঝাঁপিয়ে উঠল,—কখখনো হারত না, কিছুতেই হারত না।

শুনলেন? শুনলেন ত!—একটা জমজমাট বৈঠকের আশায় জ্বলজ্বলে চোখে ঘনাদার দিকে তাকালাম—এই ওদের মহাভারতের বিদ্যের দৌড়! কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের জিৎ নাকি হতই! আপনিই বলুন ত' ঘনাদা!

ওই উসকানিটুকু দিয়েই আমরা চুপ। ঘনাদার বাঁধানো দাঁতে মচমচে অমৃতি চিবানোর শব্দ ছাড়া ঘরে আর আওয়াজ নেই। যে খেইটা জুগিয়ে দেওয়া গেছে তা থেকে কি গুলগল্পের গালিচা ঘনাদা বুনে তোলেন তা দেখবার জন্যে আমরা একেবারে উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু ঘনাদা অমন করে শোধ নেবেন তা কি জানি! শোধ তাঁর মুখের খাবার সরিয়ে নিয়ে তাঁকে দাগা দেবার।

গালচের আশা একেবারে খণ্ডেপোশে কুঁকড়ে দিয়ে ঘনাদা যেন মর্স কোডে জানালেন,—তাই!

তাই! কি তাই?—আমরা যেমন হতাশ তেমনি অস্থির।—পাণ্ডবদের জিৎ হত-ই বলতে চান?

হ্যাঁ।—এবার ঘনাদার সংক্ষিপ্ত সরল জবাব।

দুর্যোধন যদি দলে টানতে গিয়ে ঘুমন্ত শ্রীকৃষ্ণের শিয়রে না বসে পায়ের দিকে বসত তবুও!—আমরা শেষ আশায় যেটুকু সাধ্য চাগাড় দিলাম।

যদি কেন, পায়ের দিকেই ত বসেছিল দুর্যোধন!—ঘনাদা এতক্ষণে বোমাটি ছাড়লেন।

পায়ের দিকেই বসেছিল দুর্যোধন?—চোখগুলো যতটা পারি ছানাবড়া করে বললাম,—কিন্তু মহাভারতের কোথাও ত নেই! পায়ের বদলে মাথার দিকেই দুর্যোধন বসেছিল বলে ত' লেখা আছে।

লেখা যা আছে তাও ঠিক!

তাও ঠিক?—ঘনাদার ধাঁধায় এবার একটু কাবু হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—পায়ের দিক মাথার দিক হয় কি করে?

হবার কারণ অতি সোজা! ঘনাদার মুখে যেন একটু অনুকম্পার হাসি,—শ্রীকৃষ্ণ ঘুমের মধ্যে উল্টে শুয়েছিলেন বলেই পায়ের দিকটা মাথার দিক হয়ে গিয়েছিল।

ঘুমের মধ্যে উল্টে শুয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ?—এবার আর আমাদের অবাক হবার ভান করতে হল না।

হ্যাঁ, উল্টে শুয়েছিলেন।—ব্যাখ্যা করলেন ঘনাদা, দুর্যোধন বোকা যেমন নয়, তেমনি গড়িমসি আলসেমিও তাঁর ধাতে নেই। অর্জুন রথে ঘোড়া জুতে রওনা হতে না হতেই দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিবিরে এসে হাজির। বাসুদেব ঘুমোচ্ছেন শুনে সে শোবার ঘরেই গেল অপেক্ষা করতে। ঘরে ঢুকেই সে কিন্তু একটু ফাঁপরে পড়ল। ঘুমন্ত বাসুদেবের মাথার দিকে যেমন পায়ের দিকেও তেমনি একটি করে আসন পাতা। এখন কোথায় তার বসা উচিত। ভেবে-চিন্তে শেষ

পর্যন্ত সে পায়ের দিকেই বসল।

শ্রীকৃষ্ণ এবার পড়লেন মুস্কিলে। তাঁর ত কপট নিদ্রা। যা ভেবেছিলেন দুর্যোধন তার উল্টোটা করেছে জেনে, আর কোনো উপায় না পেয়ে নিজেও তিনি ঘুমের মধ্যেই যেন স্বপ্নে উঠে পড়ার ভান করে উল্টো শুলেন।

দুর্যোধন আহাম্মক নয় কিন্তু অহঙ্কারী। শ্রীকৃষ্ণকে ঘুমের মধ্যে উল্টে শুতে দেখে তার দেমাকে একটু সুড়সুড়িই লাগল। ভাবল, বাসুদেবের ঘুমের মধ্যেও তার মত রাজাগজাকে পায়ের দিকে রাখতে বাধছে। এই দম্ভেই হল তার মরণ। নইলে মাথা থেকে আবার পায়ে গিয়ে বসতে পারত না!

কিন্তু?—আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কথা মহাভারত থেকে সরালে কে? সেই আপনার ভীমসেন দারুক আর বনবরা মার্কা মুষিক কোম্পানী?

না।—ঘনাদা বনোয়ারীর সদ্য এনে হাজির করা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটু হাসলেন,—এ বৃত্তান্ত সরাবার দরকার হয়নি, কারণ লেখাই হয়নি মহাভারতে।

লেখাই হয়নি!—আমরা সত্যিই তাজ্জব—কেন?

কেন জানতে চাও?—ঘনাদা শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে রামটান দিয়ে তার ধোঁয়ার সঙ্গেই চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন।

এ ধ্যান কি ভাঙবে?

আমরা গরুড়পক্ষী হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি।

ধ্যান শেষ পর্যন্ত ভাঙল আর চক্ষু উন্মীলন করে সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তিনি ত্রিকালদৃষ্টির যে নমুনা দেখালেন তাতে আমরা হাঁ।

কেন লেখা হয়নি তা,—সামনের ফাঁকা দেয়ালটার দিকে সিগারেটধরা আঙুল দুটোই উঁচিয়ে তিনি বললেন, ওই ওর তস্য তস্য আদি সপ্তশত সঙ্ঘ-ভ্রাতা হয়ত বলতে পারত!

মাথাগুলো তখন ঘুরতে সুরু করেছে। ঘোরার আর অপরাধ কি? সঙ্ঘ-ভ্রাতা, তস্য তস্য, আদি সপ্তশত—এ সব কি বলছেন ঘনাদা! আর বলছেন কিনা ওই সেদিনের চুনকাম-করা শাদা দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে!

ওখানে ও সব বলে সম্বোধন করছেন কাকে?

যাকে করছেন অনেক কষ্টে তাকে আবিষ্কার করা গেল এরপর।

আবিষ্কার যা করলাম চক্ষু তাতে চড়কগাছ। ঘনাদার দিকে ফিরে হতভম্ব হয়েই তাই বলতে হল,—ওখানে ত একটা শুধু সুড়সুড়ে পিঁপড়েই দেখছি!

হ্যাঁ, ওই।—ঘনাদা ধ্যাননিমীলিত হয়েই বললেন।

হ্যাঁ, ওই! সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ওরই কি বললেন, তস্য তস্য সার্দ্ধতিনসহস্র-আদি......

হ্যাঁ, হ্যাঁ!—ঘনাদা আমাদের থামিয়ে দিয়ে জ্ঞান দিলেন। ব্যাখ্যা করে বোঝালেন,—কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধের আগে-পরে যা যা হয়েছে দিব্যদৃষ্টিতে সবই ব্যাসদেবের জানা। তিনি রেখে-ঢেকে কিছু বলবার মানুষ নন, আর যত ঝড়ের বেগেই বলুন, গণেশঠাকুরের সর্টহ্যাণ্ডে তা ধরা না পড়েই পারে না। তবু যে মহাভারত থেকে ওই মোক্ষম খবরটুকু বাদ পড়েছে, তার মূল হল ওই সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ও মানে, ওরই সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার তস্য তস্য কোনো বাসাতুতু ভাই। পরমায়ু ওদের চার থেকে সাত বছরের বেশী নয় বলে গড়পড়তা হিসেবে আদি সপ্তশত সংঘ-ভ্রাতা বলছি। কথায় কথায় বুকের মধ্যে যিনি বিশ্বরূপ দেখান, বিশ্বচরাচর যাঁর রেফারীগিরিতে চলে, সেই চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মান বাঁচাতে ওই সামান্য পিঁপড়েটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। পিঁপড়ে ত নয়, ও আদি কীটাবতার, একাই পৃথিবীর প্রথম পঞ্চমবাহিনী।

ঘনাদা থামলেন। আমাদের ধরা গলায় আর টুঁ শব্দটিও নেই দেখে ঘনাদা শেষ জ্ঞানটুকুও দিলেন।

দুনিয়া যাঁর নখের টেলিভিশনে, কোথায় কি হচ্ছে তা ত আর তাঁর জানতে বাকি থাকে না। দ্বারকায় বসেই তিনি টের পেলেন, ব্যাসদেব তাঁর কপট নিদ্রার বৃত্তান্ত এবার বলতে সুরু করছেন। গড়-গড় করে বলে যাচ্ছেন ব্যাসদেব, সড় সড় করে কলম চলছে গণেশ ঠাকুরের, এমন সময় লেখার চৌকির ওপরই গড়িয়ে রাখা গণেশ ঠাকুরের শুঁড়টা সুড়সুড়িয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও সামলাতে পারলেন না গণেশ ঠাকুর। দুর্দান্ত একটি হ্যাঁচ্চোতে পুঁথির পাতা উড়ল, কলমও থামল ক'টি পলকের জন্যে। আবার যখন চলল ব্যাস-দেবের ডিক্টেশন, তখন কেষ্টঠাকুরের কারসাজি পার হয়ে গেছে।

বেড়াজালে ঘনাদা

চিলের ছাদে কিসের আওয়াজ ?

কিসের আর, একজোড়া বিদ্যাসাগরী চটির।

বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ তারপর চিলের ছাদের ওপর থেকে খোলা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়।

চটির আওয়াজ গোড়ার দিকে যা ছিল, নীচে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে আস্তে হয়ে আসবে।

বারান্দায় এসে তা একেবারে থেমে যাবে কি ?

না। একেবারে থামবে না তবে এখন আওয়াজটা হবে যেমন নিচু তেমনি আবার আস্তে। সে চটাপট চটাপট আর নেই, এখন ক্ষীণ একটু চট, এরপর পটটা অনেক দেরি করে শোনা যাবে।

কেউ যেন থতমত খাওয়া পা দুটো কেমন হতভম্ব হয়ে কোন রকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগরী চটি-পরা হতভম্ব হয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া পা জোড়া কার ?

তা কি আবার বলে দিতে হবে ?

হ্যাঁ, বুঝতে যা কারুর বাকি নেই ব্যাপারটা তাই; ও বিদ্যাসাগরী চটি-পরা পা জোড়া স্বয়ং ঘনাদার।

তা, তিনি তাঁর টঙের ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের খোলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দায় এসে অমন থতমত খাবেন কেন ? আর তারপর কেমন হতভম্ব হয়ে যেন পা টেনে টেনে যাওয়ার কারণই বা কি ?

কারণ গুরুতর। ঘনাদা ভোরবেলা উঠে তাঁর নিজের রুটিন মাফিক সব কিছু করার মধ্যে তেমন খেয়াল হয়ত না করতে পারেন, কিন্তু টিকে ধরিয়ে তামাকটি সেজে তাতে সুখটান দেবার জন্যে তৈরী হয়ে বেশ একটু অবাক হবেন।

তাঁর তামাক সাজা শেষ হবার আগেই ত বনোয়ারী বাহাদুরের ভালোমন্দ কিছু সমেত ধূমায়িত চায়ের পট পেয়ালার ট্রে নিয়ে হাজির হবার কথা। এখনো তার দেখা নেই কেন ?

একটু খেয়াল করার পর নিচেটা কেমন যেন ঠাণ্ডা বলেও মনে হবে। সকাল বেলার নিয়ম মাফিক সাড়া-শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

আরো মিনিট কয়েক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে ঘনাদাকে চিলের ছাদে বেরিয়ে আসতে হবে। সেখান থেকে গম্ভীর গলায় ডাকও দিতে হবে বনোয়ারী বলে।

তাতেও কোন সাড়া মিলবে না।

এবার বেশ একটু চিন্তিত হয়ে ঘনাদাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে আশ্চর্য ব্যাপারটার খোঁজ নেবার জন্যে।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দা পর্যন্ত নামবার পরই কিন্তু চক্ষুস্থির।

বৈঠকীঘরের দরজা বন্ধ শুধু নয়, তার কড়ায় মজবুত একটা তালা এঁটে ঝোলানো।

এই দৃশ্য দেখবার পর হতভম্ব হয়ে পা টেনে চলার আর অপরাধ কি? ঘনাদা ওই অবস্থাতেই সমস্ত বারান্দাটা পার হয়ে নিচের রান্না আর খাবার ঘর পর্যন্ত ঘুরে আসবেন নিশ্চয়।

সব দরজায় তালা ঝুলছে, মায় রান্না ভাঁড়ার খাবারঘরে পর্যন্ত।

কি হল হঠাৎ বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের? রাতারাতি কোনো যখ কি জিন ভোজবাজিতে সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে নাকি? হঠাৎ মাঝরাতের কোনো হামলার ভয়ে সবাই একসঙ্গে বাড়ি-ছাড়া?

তাহলে এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঘনাদা কিছু টের পাননি কেন?

এ রকম দিশাহারা অবস্থায় কি করবেন এখন ঘনাদা এই খাঁ-খাঁ শূন্য পুরীতে?

সেইটেই দেখবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।

এবার আর শুধু মনে মনে কল্পনা করা নয়, পুরোপুরি ব্যাপারটা ঘটাবার জন্যে যা কিছু দরকার তার কোনটা বাদ দিইনি। রামভুজ আর বনোয়ারীকে সাচ্চা ঝুট নানা রকম যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে মাঝরাতেই চুপি চুপি বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে রাতটা অন্য কোথাও কাটাতে রাজী করিয়েছি, নিচের রান্নাঘর ভাঁড়ার খাবারঘর সমেত ওপরের বৈঠকীঘর নিয়ে আমাদের সকলের সব ক'টা ঘরের তালা যোগাড় করবার ব্যবস্থা করেছি আর ঘনাদার নাজেহাল অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে নিজেদের মধ্যে লটারী করে একজনকে শেষ তালাটা দিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে বাছাই করতেও ভুলিনি।

লটারীতে এ দুর্ভাগ্যটা শিশিরের ওপরই পড়েছে। লটারীতে



ফাঁকি আছে বলে গোড়ায় বেশ একটু বেয়াড়াপনা করলেও এ ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত শিশিরকে মেনে নিতে হয়েছে। বনোয়ারী আর রামভুজ চলে যাবার পর, আমাদের বাকি সকলকে এক এক ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে শিশির বাইরে কোথাও গিয়ে রাতটা কাটিয়ে সকালে এসে আমাদের খালাস করবে এই হল ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাটা একটু অন্যায় বলে মনে হচ্ছে কি?

ঘনাদাকে জব্দ করার দিক দিয়ে একটু হয়ত বাড়াবাড়িই আছে ব্যবস্থাটায়, তবু তার জন্যে নিজেদের খুব বেশী দোষ কি দিতে পারি?

যা জ্বালান তিনি জ্বালাচ্ছেন কিছুদিন ধরে, তাতে একটু দাওয়াই তাঁকে না দিলে নয়। আর যদি দিতেই হয় তাহলে কোনো কাজ যাতে হবে না এমন যাদুর গায়ে হাত বুলোন গোছের দাওয়াই দিয়ে লাভ কি! তাঁর ওল যতখানি বুনো, আমাদের তেঁতুলও তাই ততখানি বাঘা।

এমন বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা করার আগে তাঁর তোয়াজ করতে কি কিছু বাকি রেখেছি? বুঝিয়েছি, মিনতি করেছি, ঘুষও দিয়েছি যতখানি সম্ভব দুটি বেলা, শুধু বাঁকা ঘাড়টা অন্যদিকে একটু হেলাবার জন্যে।

কি বাহার ছাদটার হবে দেখবেন ঘনাদা!—শিবু তাঁকে লোভ দেখিয়েছে,—দরজা খুলেই দেখবেন যেন ফুলের দেওয়াল। আর তার সঙ্গে কি সব পাখির মিষ্টি ডাক। বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে আছেন তাই ভুলে যাবেন।

আর আপনার খোলা ছাদ ঢাকা তো পড়ছে না।—শিশির বুঝিয়েছে,—শুধু মিহি তারের জাল দিয়ে সামনেটা ঘেরা থাকবে।

এসব শুনতে শুনতে কি করেছেন ঘনাদা? যেন কানেই যাচ্ছে না এমন ভাবে নিজের গড়গড়ার নলে টান দিতেই তন্ময় হয়ে থেকেছেন?

না। তা থাকেননি বলেই তো মুস্কিল। তাঁর কালা বোবা সাজার প্যাঁচ আমাদের জানা। তা কাটাবার উপায়ও আছে অনেক রকম।

কিন্তু এবার ঘনাদা যে নতুন চালাকি ধরেছেন! যেন উৎসাহভরে খোঁজ নিয়েছেন আমাদের ওই খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে 'প্রকল্পের'।

ও! ছাদটাকে তোমরা ফুলের বাগান আর চিড়িয়াখানা বানাতে চাও?—যেন সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছেন,—তার জন্যে লোহার জাল-টাল দিয়ে সব ঢেকে দেবে?

না, না সব ঢাকব কেন?—আমাকেই মৃদু প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে—ওই উত্তরের আলসের ওপর দুটো খুঁটি বসিয়ে তাতে লোহার খানিকটা জাল টাঙাবো, আর তার নিচে শুধু একটা লম্বা খাঁচা থাকবে জালের। টাঙানো জালে ফুলের লতা উঠবে আর খাঁচায় থাকবে দুর্গাটুকটুকি, ফুল-চুকি, মুনিয়া গোছের ক'টা পাখি।

খুব ভালো কথা!—ঘনাদা যেন আগ্রহই দেখিয়েছেন।

আর তখন আমাদের পায় কে? উৎসাহভরে আমাদের পেটে যা ছিল সব কিছু ঘনাদার কাছে উজাড় করে দিয়েছি।

আমাদের ভাগ্যে যে এখন মণিকাঞ্চন যোগ!—বলেছে শিশির। শিবুর এক মামা এসেছেন আলিপুর হর্টিকালচারাল গার্ডেনে কাজ নিয়ে।—আমি ব্যাখ্যা করেছি,—আর গৌরের এক কাকা পেয়েছেন শহরে নতুন এক এভিয়্যারি খোলার ভার।

এই দু'জনের ভরসাতেই আমাদের এই মিনি বাগান বানাবার সখ।—বলেছে গৌর।

আর শেষ জোরালো যুক্তিটা জানিয়ে শিবু বলেছে,—এমন সুযোগ তো আর রোজ রোজ মেলে না!

ঠিক! ঠিক!—ঘনাদা শিবুর যুক্তিতেই যেন পুরোপুরি কাৎ হয়ে বলেছেন,—তা এতই যখন করছ তখন আমারও কিছু সাধ যদি মেটাতে...

মেটাতাম মানে!—আমরা সবাই তখনই একবারে এক পায়ে খাড়া, —বলুন না কি চান? আপনার সাধ তো আমাদের কাছে হুকুম! সবার আগে সে সাধ না মেটালে বাগানই বাতিল।

আমাদের ভক্তির উচ্ছ্বাসেই যেন ভরসা পেয়ে ঘনাদা এবার তাঁর বাসনাটুকু জানিয়েছেন।

বেশী কিছু নয়,—একটু যেন দ্বিধা ভরেই বলেছেন ঘনাদা—তোমাদের ওই সব পাখির সঙ্গে আমার পছন্দের দুটো পাখি রাখতে বলছি। তার একটার জন্যে অবশ্য একটু স্পেশ্যাল জাল লাগবে!

তা লাগুক না যা লাগবার।—আমরা তাঁকে ঢালাও আশ্বাস দিয়েছি,—কোন ভাবনা নেই আপনার। বাজারের একেবারে সেরা জাল আমদানি করব দেখবেন, এখন পাখি-দুটো কি বলুন।

ঘনাদা পাখি দুটোর নাম-গোত্র সব জানিয়েছেন এবার।

একটাকে পাহাড়ী লোয়া বলতে পারো—ঘনাদা বিস্তারিত পরিচয়ই দিয়েছেন,—পোশাকী নাম হল ওফ্রিসিয়া সুপারসিলিওসা, আর অন্যটাকে গুণগুনিয়া বলা যায়, পোশাকী নাম হল, মেল্লিসুগা

হেলেনী।

ব্যস, আর কিছু বলতে হবে না।—গৌর পকেট থেকে নোটবই বার করে পোশাকী আর ডাক নাম টুকে নিতে নিতে জোর গলায় জানিয়েছে,—আগে আপনার পাখির ব্যবস্থা করে তার পরে বাগানের কাজ সুরু।

ঘনাদাকে অত সহজে রাজী করতে পেরে হাতে একেবারে চাঁদ পেয়ে যেদিন নেমে এসেছিলাম, সেই দিনই ঘণ্টা কয়েক বাদে সবাই চোখে অমন অন্ধকার দেখব তা কি জানতাম!

অন্ধকার দেখলাম গৌরের কথা শুনে।

ঘনাদার আবদার নোটবই-এ টুকে নিয়েই গৌর ছুটেছিল তার পক্ষীতত্ত্ববিদ কাকার কাছে।

সেখান থেকে ফিরে আসার পর তার মুখের চেহারা দেখেই আমরা সন্ত্রস্ত। ভগ্নদূতের পার্ট করতে হলে তার কাছে কিছু শেখা যায়।

গৌরের মুখে প্রথমে কোন কথাই নেই।

ব্যাপার কি?—জিজ্ঞাসা করতেই হল উদ্বিগ্ন হয়ে,—ঘনাদার পাখি পাওয়া যাবে তো?

না।—উত্তর নয়, গৌর যেন একটি হাত-বোমা ছাড়ল।

পাওয়া যাবে না মানে?—তবু শেষ আশাটুকু আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম,—ঘনাদা বাজে গুল ছেড়েছেন? যা চেয়েছেন সেরকম কোন পাখি দুনিয়ায় নেই?

না, আছে ও ছিল!—গৌরই হেঁয়ালী ছাড়ল।

তার মানে?—খিচিয়ে উঠতে হল গৌরকেই,—এখন কি তামাসার সময়?

তামাসা করছি না।—গৌর প্রায় করুণ হয়ে বোঝাল,—সত্যিই যা বলেছি, তাই। উনি যা বায়না ধরেছেন তার একটা পাখি থেকেও নেই আর অন্যটা এককালে ছিল, কিন্তু এখন নিপাত্তা। দুটোর কোনটাই তাই যোগাড় করা অসম্ভব।

আমাদের খোঁচাখুঁচিতে এরপর গৌর সবিস্তারে যা বোঝালে তাতে আমরা সত্যিই অকূল পাথারে।

ঘনাদা যে দুটি পাখি চেয়েছেন, তার মধ্যে গুণগুনিয়া বা মেল্লিসুগা হেলেনী নিপাত্তা নয়। দুনিয়ায় এ পাখিটা যথেষ্ট সংখ্যা-তেই আছে। তবে আমাদের ভারতভূমিতে ত নয়ই, সমস্ত এশিয়া ইওরোপ আফ্রিকাতেও নেই। এ পাখিটিকে পাওয়া যায় শুধু মাত্র আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণের মাঝামাঝি অঞ্চলে। গুণগুনিয়া এর

নামও নয়। দুনিয়ার সব চেয়ে ছোট প্রায় একটা ভোমরার মত ক্ষুদে এ পাখির চলতি নাম হ্যামিংবার্ড। ঘনাদা তাই থেকে গুণগুনিয়া বানিয়েছেন। ঘনাদার দ্বিতীয় পাখিটি কিন্তু দুনিয়াতেই আর আছে কি না সন্দেহ। পাখিটি আমাদের দেশের হলেও আঠারোশ ছিয়াত্তরে শেষ একবার নৈনিতালের পাহাড়ী জঙ্গলে পাবার পর আর কেউ এ পর্যন্ত এ পাখি কোথাও দেখেনি। পাহাড়ী লৌয়া নামটাও হয়ত ঘনাদারই দেওয়া। পাখিটি কিন্তু নির্বংশ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়।

গৌরের এ বিবরণ শুনে সবাইকে এবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয়েছে।

ঘনাদা যে ল্যাংটি মেরেছেন, তারপর কি আমাদের করা উচিত?

সোজা তাঁকে গিয়ে অবশ্য চেপে ধরতে পারি, আজগুবী অন্যায় আবদার করেছেন বলে।

কিন্তু তাতে নিজেরা গবেট বলে ধরা ত পড়বই, তার ওপর হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ?

তার চেয়ে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির প্যাঁচই ভালো। আমরা যে ডাহা উজবুক বনছি তা বুঝতে না দিয়ে ঘনাদার আবদারটা কোনরকমে পাল্টে দেবার ফিকিরে থাকা।

সেই ফিকিরেই তোয়াজ সাধাসাধি ঘুষ কিছু আর বাকি রাখিনি। সেদিন বিকেলেই বনোয়ারীর সযত্নে বয়ে-আনা জোড়া কবিরাজী কাটলেটের প্লেট তাঁর হাতে ধরিয়ে বলেছি,—মিস্ত্রীদের শনিবারই তাহলে কাজ সুরু করতে বলে দিই? কি বলেন?

শনিবারই কাজ সুরু করতে চাও বুঝি—ঘনাদা কাটলেট জোড়ার সদ্ব্যবহার করতে করতে যেন ভাববার সময় নিয়েছেন।

তারপর চাঁছাপোঁছা প্লেটটি ট্রের ওপর রেখে চায়ের পেয়ালার দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন,—তোমাদের সব যোগাড়-যন্ত্র হয়ে গেছে বুঝি?

তা একরকম হয়ে গেছে!—গৌর অম্লান বদনে বলেছে,—একটু শুধু অদবলবদল হয়েছে আগের ফর্দের!

অদলবদল!—ঘনাদা চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়েছেন।

হ্যাঁ।—গৌর যেন তাঁর কোঁচকানো ভুরু জোড়া লক্ষ্য না করেই বলেছে,—ওই আপনার গুণগুণিয়া আর পাহাড়ী লৌয়া-র বদলে আরো ভালো পাখির ব্যবস্থা করেছি।

আরো ভালো পাখি!—ঘনাদার মুখ এক মুহূর্তেই একেবারে আষাঢ়ের মেঘ। জোড়া কাটলেটের খুশির বাষ্পও সেখানে নেই।

কিন্তু এখন সে দিকে কালা কানা না সেজে উপায় কি? গৌর তাই যেন বাহাদুরী জানাতে বলেছে,—ভালো বলে ভালো! আপনার ওই গুণগুনিয়ার বদলে তুরপ আনাচ্ছি। মেল্লিসুগা হেলেনীর বদলে মুস্কিকাপা পার্ভা।

অনেক কষ্টে কাকার কাছ থেকে মুখস্থ করে আসা নাম দুটো বলে গৌরকে থামতে হয়েছে। ঘনাদার মুখে আর তখন কথাই নেই।

গৌর ততক্ষণে পরের মুখস্থ নাম দুটোও মনে মনে আউড়ে নিয়ে গড়গড় করে বলে গেছে,—আর আপনার ওই পাহাড়ী লোয়া-র বদলে আনছি চানক। ওফ্রিসিয়া সুপার সিলিওসার জায়গায় কোটর-নিক্স কোরামাণ্ডালিকা।

হুঁ—যেন পাতাল গুহা থেকে আওয়াজ বেরিয়েছে এবার,—তা অত কষ্টই বা করা কেন? তোমাদের চিড়িয়াঘরে তোমাদের পাখি-ই থাক। ভালোমন্দ কোন পাখিরই আমার দরকার নেই।

এই থেকে সুরু হয়ে একেবারে ছক-বাঁধা ধাপে ধাপে ঠাণ্ডা লড়াই তারপর এগিয়ে গেছে। প্রথম আমাদের আড্ডাঘরে আসা বন্ধ, তারপর নিজের ঘরে রামভুজকে দিয়ে দু'বেলার খাবার আনানো, তারপর বনোয়ারী মারফৎ বার্তা প্রচার।

হামাকে ত এক গো লরি বন্দোবস্ত কোরতে বোলিয়েছেন বড়াবাবু!

পরের দিন বিকেলে আড্ডাঘরে চা দিতে এসে বনোয়ারীর বিহ্বল করুণ অসহায়তা প্রকাশ।

লরি! লরি কি হবে বড়বাবুর?—আমার সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

আঃ লরি কি হবে বুঝলে না?—শিবুর জ্ঞান দান,—বড়বাবু দুর্জন সংসর্গ ত্যাগ করবেন ঠিক করেছেন।

তা করতে চান করুন।—গৌর এবার খাপ্পা,—কিন্তু তার জন্যে লরি কি হবে? ওঁর যা অস্থাবর তার জন্যে একটা টেম্পোও তো লাগে না। টঙের ঘরখানাই উনি লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাবেন নাকি? বেশ তাই যেন যান, আর যত তাড়াতাড়ি হয়।

রাগের অভিমানের হল্কাটা গৌরের মুখ দিয়ে বার হলেও আমাদের সকলের মনের কথাটা তখন এক।

হামেশা ভারী ভয় দেখান আমাদের ছেড়ে যাবেন বলে। কথায় কথায় এ হুমকি আর সহ্য হয় না। ছেড়ে যাওয়ার মজাটা ওঁকে

বোঝানো দরকার।

বোঝাবার সেই পণ থেকেই এ কাহিনীর গোড়ার পরিকল্পনার জন্ম। সে পরিকল্পনা অমন বেয়াড়া ভাবে ভেস্তে যাবে তা কি জানি। জোর করে বলা যায় আমাদের কোথাও গলতি কিছু হয়নি। যেমন ছকা হয়েছিল পরিকল্পনাটা ঠিক সেই লাইন ধরেই এগিয়েছে। রাত ভোর না হতে রামভুজ আর বনোয়ারীকে আগে বিদেয় করে শিশির আমাদের ক'জনকে আড্ডাঘরেই তালা বন্ধ করে, অন্য সব কামরাতেও সেই সঙ্গে তালা লাগিয়ে বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

বাড়ি ছেড়ে গেলেও বেশী দূরে কোথাও সে যাবে না। সকালে ওঠবার পর খাঁ খাঁ বাড়িতে ঘনাদার একটু উচিত শিক্ষা হবার পরই ফিরে এসে আমাদের তালা খুলে বার করবে।

শিশির যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে তালা এঁটে চলে যাবার পর থেকেই আমরা একেবারে কান খাড়া করে সজাগ।

কিন্তু যার জন্যে এত আয়োজন, ছাদের সিঁড়িতে ঘনাদার সেই ভয়ে ভাবনায় নামা পায়ের আওয়াজ কই?

ঘনাদার খাওয়া শোয়া ওঠা বসা সব তো একেবারে ঘড়ি ধরা। আজ তাঁর সেই ঘড়িই বিকল হয়ে গেল নাকি? তাঁর এতটুকু সাড়া শব্দও নেই।

না। আছে। ওই তো টিলের ছাদে তাঁর বিদ্যাসাগরী চটির কেমন একটু অধৈর্যের চট-পট ফট-ফট্। তারপর খোলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে অধৈর্যের আওয়াজটা একটু দ্বিধা-সংশয়ে ঢিমে হয়ে আসা।

তারপর ঠিক যেমনটি কষে রাখা হয়েছিল, ঘনাদার পদধ্বনি একেবারে সেই ছন্দে মেলানো।

বারান্দায় নেমেই চটপটের জায়গায় চটি জোড়ায় যেন একটু ঘসটে চলা। ঘনাদা এখন হতভম্ব হয়ে তালাগুলো দেখছেন নিশ্চয়।

আড্ডাঘরের সামনে থেকে যেন নেহাৎ দিশাহারা হয়ে পরের কামরাটা পর্যন্ত পা দুটো টেনে নিয়ে যাওয়া।

তারপরই সভয়ে আবার ওপরের দিকে ছুটের উপক্রম।

কি, ব্যাপার কি ঘনাদা!

ঠিক একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে সেই মুহূর্তে নিচের সিঁড়ি দিয়ে উঠে শিশিরের যেন বিস্মিত সম্ভাষণ।

সেই সঙ্গে ঝটপট তালা খুলে দেওয়ার সঙ্গে আমাদেরও ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘনাদাকে ঘিরে ধরা।

এ কি আপনি এমন সময় এখানে!—আমাদের কেমন একটু সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

হাতে হাতে ধরা পড়ে এবার ঘনাদা একেবারে বেড়াজালে ঘেরা।

কোন দিকে কোন ফাঁক নেই পিছনে বার হবার। কি করবেন এখন, কি বলবেন?

ঘনাদা কিন্তু বললেন। যা বললেন, তাতে সবাই আমরা হাঁ। আমরা তাঁকে লজ্জায় ফেলব কি, তিনিই আমাদের অভয় দিলেন।

না, আর কোন ভয় নেই।—ঘনাদার দাঁড়াবার ভঙ্গি থেকে গলার স্বরে পর্যন্ত পরম বরাভয় আশ্বাস আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রশস্তি—খুব ভালো করেছ দরজায় তালা লাগিয়ে রেখে। ওই তালা দেখেই চলে গেছে।

এসব শুনে মাথায় চক্কর দেওয়াটা খুব অন্যায় নিশ্চয় নয়। কিসের ভয় ছিল আর কেন তা আর নেই, দরজায় তালা দেখে কে-ই বা চলে যাওয়ায় আমাদের বিপদ কাটল এসব খোলসা করবার জন্যে ঘনাদাকে আর ওপরে যেতে না দিয়ে বৈঠকীঘরেই টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কি করতে পারি তখন?

বনোয়ারী রামভুজের এখনো আসতে দেরী হবে হয়ত, কিন্তু আরাম-কেদারাটা আছে, শিশিরের সিগারেটের টিনও। তাই প্রণামী দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল,—দরজায় তালা দেখে চলে গেছে কে?

কে আর!—ঘনাদা শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে জুত করে টান দিয়ে বললেন—সেই সেরা দো মার-এর শিকারের আস্তানা থেকে হন্যে হয়ে যে আমায় সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কার্ল পাউলো।

কার্ল পাউলো!—নামটা দু'বার ভিজে সড়গড় করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—সেই পাউলোকেই আপনার ভয়? তা সে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন! মারবে-টারবে নাকি?

হ্যাঁ, পারলে সে আমায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটবে কিন্তু তার আগে সেরা দো মার-এর ধাঁধাটার উত্তর না বার করতে পারলে শান্তি পাবে না।

ওই পাউলোকে একটা ধাঁধা শুনিয়ে তার উত্তর না জানিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন বুঝি!—আমাদের বলতেই হল,—খুব অন্যায় কিন্তু।

হ্যাঁ, অন্যায় একদিক দিয়ে তো বটেই।—ঘনাদা স্বীকার করলেন, তা ছাড়া কার্ল পাউলোর ধারণা তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা

করেছি।

সত্যি তাই করেছেন নাকি?—আমাদের গলায় অবিশ্বাস।

হ্যাঁ, যা করেছি তা একরকম বিশ্বাসঘাতকতাই ভাবতে পারে পাউলো। কারণ সে-ই তো আমায় সঙ্গে করে তার নিজের প্লেনে...

ঘনাদা থামলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফিরিয়ে দেখি দরজায় স্বয়ং শ্রীমান বনোয়ারী হাজির; আমাদের নির্দেশ মত ভোরটা পার করে দিয়ে রামভুজের সঙ্গে সে যথাসময়েই ফিরে এসেছে।

অবস্থাটা আমাদের পক্ষে একটু অস্বস্তির হতে পারত, কিন্তু গৌর চায়ের সঙ্গে টা হিসেবে টোস্ট, ডবল অমলেট আর পাড়ার বিখ্যাত খাস্তা কচুরির লম্বা ফরমাস দিয়ে সেটা কাটিয়ে দিলে।

ঘনাদাকে এবার আর উস্কে দেবার দরকার হল না। বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেন থেকে সোজা কার্ল পাউলোর প্লেনে গিয়ে উঠলেন আমেরিকার টেক্সাসের ডালাস শহরের এয়ার পোর্টে।

বললেন,—ডালাসের এয়ার পোর্টে আমি পাউলোকে দেখে যতখানি বিব্রত, সে আমায় দেখে ততখানি অবাক আর খুশী।

আরে দাস! তুমি এখানে কি করছ?—দূর থেকে আমায় দেখেই কাছে এসে পেটে একটা বুলডোজার মার্কা আদরের গুঁতো দিয়ে পাউলো বললে,—তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।

আমিও পারিনি!—পেটের আচমকা গুঁতোটার ঠেলা একটু কষ্ট করে সামলে নিয়ে বললাম,—তা এখন চলেছ কোথায়?

কোথায় যাচ্ছি দেখতেই তো পাবে!—বলে পাঁচমণি বপুটি কাঁপিয়ে পাউলোর সে কি হাসি!

আমি দেখতে পাব!—তার লাউঞ্জ-ফাটানো হাসির মাঝখানে বলতেই হল অবাক হবার ভান করে,—কি বলছ?

ঠিকই বলছি।—হাসির মাত্রাটা একটু শুধু কমিয়ে বললে পাউলো,—তুমি তো আমার সঙ্গেই যাচ্ছ। দেখা যখন হয়েছে তখন আর তোমায় ছাড়ি!

ছাড়লে না সত্যিই। কার্ল পাউলোর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেয়ে ব্রেজিলের আনাকোণ্ডার পাক কি অক্টোপাসের নুলোর আলিঙ্গন ছাড়ানো সোজা।

পাউলোর সঙ্গে দেখা হয়ে তারই প্লেনে সঙ্গী হয়ে যাওয়া নেহাত নিয়তির বিধান বলেই মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বেশী আপত্তি করলাম না। নিজের প্লেনের টিকিট আমার পকেটেই রইল, সেইসঙ্গে জুয়ান ভার্গাসের চিঠিটাও।

ডালাসের এয়ার পোর্টে প্লেনে চড়তেই আমি এসেছিলাম। তবে সেটা নেহাত সাধারণ প্যাসেঞ্জার প্লেনে, পাউলোর নিজস্ব জেট বিমান নয়। সে প্যাসেঞ্জার প্লেনে গেলে আমার যা গন্তব্য, সেখানে একটু দেরিই হত ঘুর-পথে পেঁছোতে। কার্ল পাউলো আমার সে কষ্টটুকু যদি জোর করে বাঁচিয়ে দেয়, তাহলে কত আর আপত্তি করা যায়?

নিজস্ব প্লেনটা পাউলো একেবারে বাদশাহী মেজাজে সাজিয়েছে। কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরই সেখানে অভাব নেই। প্লেনে নয়, পাউলোর নিজের বাড়িতেই যেন বসে আছি।

সেই বাদশাহী বিলাসের মধ্যে বসিয়ে প্লেনে যেতে যেতে পাউলো তার নতুন পরিকল্পনার কথা সোৎসাহে আমায় শোনালে।

ব্রেজিলের মাথায় উত্তর-পূব দিকে সেরা দো মার পর্বতমালা। সেই সেরা দো মার-এর দক্ষিণে বিরাট এলাকার সে মালিক। সেখানে সে এতদিন শুধু শিকারে গিয়ে থাকবার একটা আস্তানাই করে রেখে-ছিল। এখন সেখানে সে রবারের একটা বিরাট কারখানা বসাতে চায়। মোটর এরোপ্লেন ইত্যাদির টায়ার টিউব থেকে শুরু করে রবারের যা কিছু সম্ভব সব সেখানে তৈরী হবে। ও অঞ্চলে মজুরী সস্তা। দুনিয়ার সেরা বেলেম-এর রবারও কাছেপিঠেই জন্মায়। তা ছাড়া সমুদ্রের কাছে আর আবহাওয়া জুৎসই বলে মাল তৈরী আর চালানের অন্য সুবিধেও যথেষ্ট। এমন একটা লাভের পরিকল্পনা শুধু এক তেএঁটে হাড়-বজ্জাতের বদমায়েসীর দরুন ভেস্তে যেতে বসেছে।

এতদূর পর্যন্ত শুনে একটু অবাক হবার ভান করে বলতেই হল,—তাই নাকি?

শোন না আগে!—তার রবারের কারখানায় যে বাদ সাধছে তার ওপরকার রাগটা একটা দুরমুশপেটানো কিলে আমার পিঠেই ঝেড়ে পাউলো বললে, কয়েক বছর আগে এ কারখানার কথা যখন মাথায় আসেনি, তখন না বুঝে এক হতভাগা জুয়ান ভার্গাসকে ওখানকার অনেকখানি জায়গা ইজারা দিয়েছিলাম। সে হতভাগা জুয়ান সেখানে গরু ঘোড়ার 'র‍্যাঞ্চ' বসিয়েছে। এখন এত সাধাসাধি করছি, তার ইজারার টাকা ফেরৎ দিয়ে গরু-ঘোড়া সমেত সমস্ত 'র‍্যাঞ্চ' কিনে নেব বলছি তবু সে বদমাসটা কিছুতেই তার দখল ছাড়বে না। ডেকে পাঠালে আসে না। লোক দিয়ে বলে পাঠায় যে রবারের কারখানার চেয়ে গরু-ঘোড়ার কারবার অনেক পবিত্র জিনিস। প্রাণ থাকতে তার দখল সে ছাড়বে না। এরকম বদমায়েসকে শায়েস্তা করবার সোজা

ওষুধ আছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে কারখানা বসানোর ব্যাপার নিয়ে ওই জুয়ানের সঙ্গে গোলমালের কথাটা রাজধানী ব্রাসিলিয়ার খাস দপ্তরে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। খবরের কাগজেও লেখালেখি হয়েছে এই নিয়ে। এখন হঠাৎ ওই বদমাসটার ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে, বড় বেশী জবাবদিহির দায়ে পড়তে হতে পারে। কারখানা তাতে আরো পিছিয়ে যাবে।

একটু থেমে আমার আগাপাস্তলা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তার আসল মতলবটা জানালে পাউলো।

গলায় যেন একটু আদর ঢেলে বললে,—তোমাকে যে পেয়ে গেছি এইটেই আমার ভাগ্য, দাস। তোমায় একটা কাজ আমার করে দিতেই হবে। সেই জন্যেই তোমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

মুখে কিছু না বলে তার দিকে অবাক হয়ে চাওয়া চোখেই প্রশ্নটা রাখলাম।

তুমি প্যাঁচের রাজা।—আমায় তাতিয়ে বললে পাউলো,—যে কোন ফিকিরে হোক ওই পাজি জুয়ান ভার্গাসকে তোমায় বাগ মানাতে হবেই।

আমাকে!—এবার বিস্ময়ে সরব হলাম।

হ্যাঁ, তোমাকে!—সঙ্গে সঙ্গে কার্ল পাউলোরও মুখের চেহারার সঙ্গে গলার স্বরটা বদলাল। আগের সে মধু আর নেই।

না, না, ওসব আমি পারব না!—ইচ্ছে করেই আপত্তিটা বেশ জোর দিয়ে জানালাম,—আমায় খাতির করে নিয়ে যাচ্ছ, যাচ্ছি। তোমার ওসব ঝামেলায় আমি ঘাড় পাতব কেন?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড একটি রদ্দা।

ঘাড় পাতবি জান বাঁচাবার জন্যে রে কেলে নেংটি!—পাউলোর গলা যেন এবার কার্বলিক অ্যাসিডে মাখানো,—তোর মত একটা উচ্চিংড়েকে কি এমনি ধরে নিয়ে যাচ্ছি মনে করছিস! ভুজুং দিয়ে, কি তুরুম ঠুকে, যা করে হোক, জুয়ান ভার্গাসের ও ইজারা বাতিল করাতে তোকে হবেই। আর কিছু না পারিস চুরি করবি ওর সে ইজারার দলিল। কি? বুঝেছিস এবার?

মাথা নেড়ে জানালাম যে বুঝেছি। তারপর বেশ যেন ঢিট্ হওয়া করুণ বশংবদ গলায় জানালাম,—কিন্তু আমায় তাহলে একটু সুবিধে দিতে হবে যে।

কি সুবিধে?—কার্ল পাউলো খেঁকিয়ে উঠল।

একটু ঘুরে ফিরে বেড়াবার সুবিধে!—যেন ভয়ে ভয়ে নিবেদন

করলাম—ও তল্লাটে দু-চারদিন টহলদারি করতে করতে ওই তোমার কি নাম, জুয়ান না তুয়ানের সঙ্গে ভাব জমাতে হবে ত। নইলে হট্ করে গিয়ে হাজির হলে সন্দেহ করবে যে!

থাম্ থাম্!—ধমকে থামিয়ে দিয়ে পাউলো বললে,—বেশী বকতে হবে না। ঘোরাফেরা করার জন্যে আমার শিকারের আস্তানার একটা জীপ-ই তুই পাবি। আর কিছু চাস?

না।—কৃতজ্ঞতায় প্রায় গলে গিয়ে জানালাম,—ওই জীপটা যে দিচ্ছ সেই দয়াই যথেষ্ট।

কিন্তু তুই......?—হঠাৎ একটু যেন সন্দিগ্ধ সুরে পাউলো জিজ্ঞাসা করলে,—তুই তো শুধু ওই একটা ফোলিওব্যাগই সঙ্গে এনেছিস। আর কিছু নেই?

না। আর কিছুতে কি দরকার?—সবিনয়ে জানালাম,—আকাশে উড়তে যত হাল্কা থাকা যায়।

কোঁচকানো ভুরু জোড়া সোজা হয়ে এলো এবার। পাউলো একটু ঠাট্টার সুরেই জিজ্ঞাসা করলে,—কি আছে ওই ব্রীফ-কেসে? কি এমন দামী নথিপত্র?

না, সেসব কিছু নেই।—সরলভাবেই জানালাম, দাঁতমাজা দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আর এক প্রস্থ হাল্কা পোশাক বাদে যা আছে তা শুনলে হাসবে।

বেশ হাসা তাহলে।—পাউলোর মেজাজ এখন খোশ।

আস্তে আস্তে বেশ স্পষ্ট করে বললাম,—আছে খানিকটা জাপানী কুয়াশা, এক কৌটো ভেসলিন, ছোট এক শিশি ডাইফেনা-ডিয়োন আর এক জোড়া মোটা চামড়ার দস্তানা।

সেকেন্ড দুয়েক সামান্য ভুরু-কুঁচকে থেকে সত্যিই এবার হেসে ফেললে পাউলো। তারপর একটু কড়া গলাতেই বললে,—ওসব ভড়কি আর যাকে পারিস দিস। কাজ যা দিয়েছি তা হাসিল করতে না পারলে ওসব ভড়কি তোর সঙ্গে গোরেই যাবে মনে রাখিস। নামবার পর এক হপ্তা তোকে সময় দেব। তার মধ্যে জুয়ান ভার্গাসকে বাগ মানানো চাই-ই।

নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে মনে মনে বললাম,—আমার পকেটের জুয়ান ভার্গাসের চিঠিটা যদি এখন দেখতে পেতে পাউলো!

সেরা দো মার পাহাড়ের ধারে কার্ল পাউলোর শিকারী আস্তানায় নামবার পর নিজের একটা কামরা পেয়ে একটু নিরিবিলি হবার পর

জুয়ান ভার্গাসের চিঠিটা আবার বার করে পড়লাম।

চিঠির কথাগুলো আমার প্রায় অবশ্য মুখস্থ হয়ে গেছে। নিউ অর্লিনস্ থেকে ওয়াশিংটন যাবার পথে আমার ট্রাভেল এজেন্সী মারফৎ এই চিঠিটা পেয়েই আমি প্ল্যান বদলে ডালাস থেকে ব্রেজিলের ব্রাসিলিয়া প্যাসেঞ্জার প্লেন ধরবার জন্যে এয়ার পোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানে যেন নিয়তির নিজের কারসাজিতে কার্ল পাউলোর সঙ্গে দেখা। সে অমন জোর করে ধরে না নিয়ে এলে বেশ একটু ঘুর পথে আরো দেরিতে এই জুয়ানের কাছে আমায় পৌঁছোতে হত। জুয়ান যে দারুন ব্যাপারের কথা লিখেছে তাতে যেমন করে হোক না এসে অবশ্য আমি পারতাম না।

জুয়ান তার চিঠিতে প্রায় দিশাহারা হয়ে আমার সাহায্য চেয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে এই অঞ্চলের বিস্তৃত জমি ইজারা নিয়ে সে যখন গরু ঘোড়ার পাল বাড়াবার 'র‍্যাঞ্চ' বসায় তখনকার কথা আমি জানি। নিজের যা কিছু সম্বল সব সে এই আদর্শ র‍্যাঞ্চে ঢেলে দিয়েছিল। সে দুঃসাহস তার বৃথা হয়নি। এই ক'বছরে তার 'র‍্যাঞ্চ' —সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক সর্বনাশা অভিশাপে সব ছারখার হবার যোগাড়। তার গরুর ঘোড়ার পালে ভয়ঙ্কর রকম মড়ক লেগেছে। সে মড়কের কারণও অবিশ্বাস্য। পালে পালে তার গরু ঘোড়া মরছে জলাতঙ্ক রোগে। ভয়ে দুর্ভাবনায় তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। তার এ অঞ্চলের জমির মালিক কার্ল পাউলো কিছুদিন থেকে তার কাছে জমিগুলো ফেরৎ চাইছে। কারখানা বসিয়ে এই পবিত্র সুন্দর অঞ্চলটা নোংরা বিষাক্ত করতে দিতে চায় না বলে এতদিন সে পাউলোর পেড়াপিড়ি বা হুমকি কিছুতেই আমল দেয়নি। কিন্তু এবার বোধহয় নিরুপায় হয়ে তাকে নিজে থেকে সেধেই র‍্যাঞ্চ বেচে চলে যেতে হবে। এই বিপদের মধ্যে শেষ পরামর্শের জন্যে সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

কার্ল পাউলো আমায় সাতদিন মাত্র সময় দিয়েছিল।

সাতদিন কিন্তু আমার লাগল না। মেয়াদের দুদিন বাকি থাকতেই সেদিন বিকেলে পাউলোর নিজের কামরায় গিয়ে হাজির হলাম। হাতে আমার নিজের ব্রিফকেসটি।

পাউলো তখন তার আরাম কেদারায় গা এলিয়ে কি একটা ডায়রি গোছের খাতার পাতা ওল্টাচ্ছে।

কোন সম্ভাষণ না করে তার কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে

বসলাম।

একটু চমকে ওঠার সঙ্গে মুখটা একটু লাল হয়ে উঠলেও পাউলো নিজেকে সামলাল। তারপর গলার স্বরটা যথাসম্ভব হাল্কা করে জিজ্ঞাসা করলে,—কি? এ ক'দিন তো চুলের টিকিটি দেখতে পাইনি। কেন? আর দুদিন মাত্র বাকি তা মনে আছে?

দুদিন আর লাগবে না।

আমার গলায় তাচ্ছিল্যের সুরটাতেই কেমন একটু সন্দিগ্ধ হয়ে পাউলো এবার সোজা হয়ে উঠে বসে ভ্রূকুটির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে,—লাগবে না মানে? কাজ হাসিল হয়ে গেছে এর মধ্যে? জুয়ান ভার্গাস রাজী হয়েছে?

জুয়ান ভার্গাসের রাজী না রাজী হওয়ার কি আছে!—আগের মতই তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছি,—তার সঙ্গে দেখাই হয়নি। হয়নি মানে করিনি।

তার সঙ্গে দেখাই করিসনি!—রাগে পাউলোর মুখ দিয়ে যেন ফেনা বেরুবে মনে হল,—আর পাঁচ দিনে কাজ হাসিল করে তুই আমার কাছে সাহস করে এসে বসেছিস!

পাউলো ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ইজি চেয়ারটার খোল থেকে উঠতে গেল।

পিঠে একটি ছোট্ট কিল দিয়ে তাকে আবার কেদারাতেই বসিয়ে দিয়ে বললাম,—অস্থির হচ্ছ কেন মিছিমিছি? আসল যা কাজ তা পাঁচ দিনে সত্যিই হাসিল হয়ে গেছে যে! আজ এক বছর ধরে মোক্ষম শয়তানী ফন্দি তুমি খাটাচ্ছ বটে। আমার সঙ্গে এবারের প্লেনেও একটি ক্রেটে শয়তানী চক্রান্তের সব যমের দূতদের বয়ে এনে নামাতে দেখলাম। তাদের সব খেল কিন্তু এবার খতম। জুয়ান ভার্গাসকে বাগ মানাতে না পেরে তাকে একেবারে ধনে প্রাণে মারবার যে ফন্দি তুমি করেছিলে তা যেমন পৈশাচিক তেমনি ভয়ঙ্কর। কোথাও কিছু নেই, তার গরু ঘোড়া পালে পালে আচমকা মারা যেতে শুরু করল এক বছর আগে থেকে। আর মারাও যাচ্ছে এ রোগ সে রোগ নয় হাইড্রো-ফোবিয়া মানে জলাতঙ্ক রোগে যার চিকিৎসা নেই। কোথা থেকে এ রোগ এল গূঢ় রহস্য না জানলে কেউ ভেবেও পাবে না। ক'জন জানে যে জলাতঙ্ক রোগ শুধু ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড়েই হয় না, তার চেয়ে মারাত্মক উৎস এ রোগের আছে?

পাউলো আবার একবার লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে একটি আলতো রদ্দায় তাকে কেদারায় কাৎ করে দিয়ে বললাম,—সে উৎস

হল প্রাণীজগতের সত্যিকার রক্তখাকী এক রাক্ষসী, ডেস্‌মোডস্‌ রোট্যন্‌ডস্‌, যার চলতি নাম হল ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। ভ্যাম্পায়ার সম্বন্ধে সত্য মিথ্যে অনেক রকম কিংবদন্তীই আছে। প্রাণীটিকে চোখে দেখলে তার সর্বনাশা ভীষণতা বোঝা কঠিন। এক কাঁচ্চা থেকে খুব বেশী হলে তিন কাঁচ্চা এই জীবটির ওজন। কিন্তু রাত্রে ঘুমন্ত মানুষ গরু ঘোড়ার রক্তই শুধু সে চুষে খেয়ে যায় না, সাংঘাতিক জলাতঙ্ক রোগের বিষও শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের এই ভয়ংকর ক্ষমতার কথা জেনে তুমি অনেক টাকা খরচ করে বিশেষভাবে তৈরী কাঠের খাঁচায় তোমার প্লেনে বেশ কিছু ঝাঁক সে বাদুড় আনিয়ে জুয়ানের র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি সেরা দো মার পাহাড়ের গুহায় ত ছাড়বার ব্যবস্থা করেছ। এবারও এক ঝাঁক তুমি এনে ছাড়তে ভোলনি। কিন্তু সব শয়তানী ফন্দি তোমার ভণ্ডুল। যত ভ্যাম্পায়ার তুমি ছেড়েছ তার একটাও আর বেঁচে নেই। কাল নিজে গিয়ে সবগুলো পরীক্ষা করে তুমি দেখে আসতে পারবে। আসল মরণকাঠি নেড়ে রক্তচোষা মরণ-বিষ-ছড়ানো সব রাক্ষসী আমি শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি।

শেষ একটি থাবড়ায় পাউলোকে ইজিচেয়ারে একেবারে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বললাম,—অকারণে ব্যস্ত হয়ো না। এখন ওঠার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। তুমি যতক্ষণে উঠে দাঁড়াবে ততক্ষণে আমি তোমারই দেওয়া জীপে প্লেনে পৌঁছে যাব। সেখানে একজন পাইলটকে আমি সব কথা বলে নিজের দলে টেনেছি। আর একজনকে আগে থাকতে সেখানে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা আছে। তোমার প্লেন আমি চুরি করব না। শুধু কিছুক্ষণের জন্যে ধার নিয়ে ওই প্লেনে হণ্ডুরাস কি গুয়াতেমেলা কোথাও গিয়ে নামব। বেঁধে রাখা পাইলট ছাড়া পেয়ে সেখান থেকে তোমার প্লেন ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তোমায় শেষ একটা উপদেশ। এরপর আর কোন শয়তানী চালাকির চেষ্টা কোরো না। এখানে কারখানা বসানোর মতলব ছেড়ে অন্য কোনো কারবারে তোমার শয়তানী বুদ্ধি খাটাও গিয়ে। আচ্ছা, বিদায়!

আমি উঠে আসতেই কেদারা থেকে ওঠবার চেষ্টা করে পাউলোর সে কি করুণ মিনতি!

শোনো, শোনো দাস! সত্যি তোমার কাছে হার স্বীকার করছি। রাক্ষুসী ভ্যাম্পায়ারদের মরণকাঠি কি তা-ই শুধু বলে যাও!

কে তার জবাব দেয়!

তার আকুল মিনতি জীপের আওয়াজেই তখন চাপা পড়ে গেছে।
ঘনাদা থামলেন।

দরজায় ট্রে হাতে বনোয়ারী। ট্রে থেকে প্লেট নামানো থেকে সেটি একবারে চাঁছাপোঁছা না হওয়া পর্যন্ত ঘনাদার মুখে আর কথা নেই।

আমাদের ধৈর্য অসীম।

প্লেটটা তিনি নামাবার পরই মুখিয়ে থাকা কথাটা জানালাম। জবাবটা কিন্তু আমাদের যে চাই! রাক্ষুসীদের মরণকাঠিটা কি ঘনাদা?

মরণকাঠিটা হল,—শিশিরের এগিয়ে দেওয়া সিগারেটের টিনটা খুলতে খুলতে ঘনাদা বললেন,—ওই ডাইফেনাডিয়োন। মানুষের, বিশেষ করে হার্টের রুগীর পক্ষে এটা দামী ওষুধের সামিল, কিন্তু ইঁদুর বাদুড় গোছের প্রাণী মারবার একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। রক্ত চুষে যারা বাঁচে এ ওষুধ তাদের রক্ত জল করে দিয়েই মারে। ওষুধটার গুণ জানবার পরও এটা ব্যবহারের উপায় প্রথমে পাওয়া যায়নি। রাক্ষুসে ভ্যাম্পায়ার বাদুড় এ ওষুধ খেলে মরবে। কিন্তু তাদের খাওয়ান যাবে কি করে? এক একটা করে বাদুড় ধরে ওষুধ গেলানো তো যায় না। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের একটা অভ্যাসের কথা জেনে এ সমস্যার আশাতীত সমাধান বার করা গেছে। ভ্যাম্পায়ারের একটা অভ্যাস হল বাঁদরদের মত পরস্পরের গা চেটে পরিষ্কার করা। চামড়ার দস্তানা পরা হাতে একটা রাক্ষুসীকে ধরে তার গায়ে আধ চামচ ভেসলিনের সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ মিলিগ্রাম ডাইফেনাডিয়োন মিশিয়ে লাগিয়ে দিলেই হল। একটা ওষুধ মাখানো রাক্ষুসীর গা চেটে গোটা পঁচিশ ত্রিশ অন্য রাক্ষুসীর ভবলীলা শেষ হবে।

ক'দিন ধরে পাউলোর জীপে ঘুরে ঘুরে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের গুহাগুলো খুঁজে বার করে এই কাজই করেছিলাম। পাউলো তার শয়তানী ফন্দিতে মোটমাট ষাট-সত্তরের বেশী ভাম্পায়ার আমদানি করতে পারেনি। তার উদ্দেশ্য অবশ্য তাতেই সিদ্ধ হয়েছে। আমারও সুবিধে হয়েছে দিন তিনেকের মধ্যে তাদের সব ক'টাকে খতম করার।

ওষুধের গুণ যতই হোক ওই জাপানী কুয়াশা যাকে বলেছি তা না থাকলে সব কিছুই মিথ্যে হয়ে যেত। জাপানী কুয়াশা আসলে হল কুয়াশার মত সূক্ষ্ম নাইলনের একরকম অদৃশ্য জাপানী জাল। তার সুতোগুলো এত সূক্ষ্ম যে রাত্রে তা অতি তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টিতেও একেবারে দেখাই যায় না, বাদুড়দের শব্দতরঙ্গও তাতে কাজ করে না। অত বেশী মিহি বলেই এ জালের নাম জাপানী কুয়াশা জাল।

ভ্যাম্পায়ারদের গুহার মুখে এই কুয়াশা জাল টাঙিয়েই তাদের সবক'টাকে আমি ধরতে পেরেছিলাম।

ঘনাদা মুখের সিগারেট ধরিয়ে যথারীতি শিশিরের টিনটা ভুলে হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন।

তিনি দরজার কাছে যাবার পর শেষ প্রশ্নটা হঠাৎ মনে পড়ল।

গলা ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা এতদিন বাদে ওই কার্ল পাউলো আপনার খোঁজ পেল কি করে?

ওই জাপানী কুয়াশা থেকে!—ঘনাদা ফিরে দাঁড়িয়ে অনুগ্রহ করলেন,—চলে আসবার পর নির্দেশ লিখে ওটা ওষুধপত্র সমেত জুয়ান ভার্গাস-এর কাছে পার্শেল করে পাঠিয়েছিলাম কি না। সেদিন আবার তোমাদের চিড়িয়াঘরের কথায়, আশার গুণগুনিয়া রাখবার জন্যে জুয়ানের কাছে সেটা আবার চেয়ে পাঠিয়েছি। সেই চিঠি কোনভাবে পাউলোর হাতে পড়েছে বোধহয়। জাপানী কুয়াশা সুতরাং আর পাবার আশা নেই।

তার দরকারও নেই অবশ্য।—ঘনাদা একটু যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—তোমরা গুণগুনিয়া তো আর আনছ না।

ঘনাদা চলে গেলেন।

এরপর চিড়িয়াঘর বানাবার উৎসাহ আর থাকে?

কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা

ভুল!—বললেন ঘনাদা।

মনে মনে বললাম,—শুরু হল গুল! মুখে কিন্তু পুরো ভ্যাবাচ্যাকা ভাব ফুটিয়ে বললাম,—বলেন কি ঘনাদা? কুরুক্ষেত্রের ওই পরিণাম হল দুর্যোধনের শুধু একটি ভুলে?

কি ভুল বলব?—শিবু আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে—বিচক্ষণতা দেখাতে এল,—যুদ্ধের তারিখটা আরো একটু পিছিয়ে না দেওয়া।

ঘনাদা ত নয়ই, আমরাও কেউ তার বিচক্ষণতায় উৎসাহ না দেখালেও সে সবিস্তারে তার ব্যাখ্যাটা আমাদের না শুনিয়ে ছাড়ল না।—এই যেমন আমাদের ইলেকশনে হয়। বেশ জাঁকিয়ে যারা গদিতে বসে আছে তারা ভাবে তাড়াতাড়ি ইলেকশন করালে নতুন উটকো দল যোগাড়যন্তর করে লড়বার জন্যে তৈরী হবার সময়ই পাবে না। দখলদার দলই ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘুরিয়ে বাজিমাৎ করবে। কিন্তু সেইখানেই হয় ঠিকে ভুল। দুর্যোধন ভেবেছিল তাড়াতাড়ি যুদ্ধটা আরম্ভ করিয়ে দিলে পান্ডবেরা কৌরবদের মত সৈন্য যোগাড় করতে পারবে না—

তা ত পারেইনি।—শিশির একটানে শিবুর মাঞ্জা দেওয়া যুক্তির সুতো ভোকাট্টা করে দিলে।—কোথায় কৌরবদের এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য আর পান্ডবদের মোটে সাত। ভুল এখানে নয়—দুর্যোধনের মারাত্মক ভুল হয়েছে পান্ডবেরা বোকার মত যে প্রস্তাব করে বসেছিল তাতে তৎক্ষণাৎ রাজী না হয়ে যাওয়া। কি চেয়েছিল পান্ডবেরা। পাঁচটা মাত্র গাঁ। কেমন গাঁ—কোথায়, তা ত কিছু বলেনি। একসঙ্গে দিতে হবে এমনও কথা ছিল না। পাঁচ ভাইকে জম্বু দ্বীপের পাঁচ ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পাঁচটা অখদ্দে গাঁ দিলেই চুকে যেত ল্যাটা। নামগুলো যাই হোক ম্যালেরিয়া কালাজ্বর পেলেগ-টেলেগ তখন কি আর ছিল না। খুব ছিল। বেছে বেছে সেই রকম ক'টা গাঁয়ে পাঁচ ভাই পান্ডবকে বসিয়ে দিলেই ব্যাস আর দেখতে হত না। যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব ত নস্যি—ওই ভীমার্জুনও বছর ঘুরতে না ঘুরতে কুপোকাত! কি বলেন ঘনাদা?



ঘনাদা আবার কি বলবেন?—গৌর শিশিরের বাহাদুরীর ফাঁপা ফানুসটা ঘনাদার কাছে পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই খুঁচিয়ে ফুটো করে বললে,—ভীমার্জুন পাঁচ ভাইকে পাঁচটা বনগাঁ দিলেই দুর্যোধন যেন কুরুক্ষেত্রে না নেমে পান্ডবদের রামঠকান ঠকাতে পারতেন। আরে পাঁচটা মাত্র গ্রাম চেয়ে পাঠিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। শুনতে ভারী সহজ সরল আহাম্মকের মত প্রস্তাব। কিন্তু ওর ভেতর যা প্যাঁচ, তা শকুনির পাশার ঘুঁটিতেও ছিল না সেই দ্যূতক্রীড়ার সময়। ও প্যাঁচ যার তার ত নয়—প্যাঁচের চ্যাম্পিয়ন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মাথা থেকে বার করা। এ প্রস্তাব মেনে নিলে দুর্যোধন কিরকম গাঁ যে দিতেন তা বাসুদেবের ভালো করেই জানা ছিল। তাঁর প্যাঁচের খেলা শুরু জম্বুদ্বীপের পাঁচ কোণায় পাঁচটি গ্রাম পাবার পর।

গৌরের ব্যাখ্যান শুনতে শুনতে চোখটা ঘনাদার দিকেই রাখতে হয় তাঁর মেজাজের ওয়েদার রিপোর্ট ঠিকঠাক নিয়ে যাবার জন্যে। তাঁর দান ফেলতে দেরি করিয়ে দেবার জন্যে একটু আধটু তাতলে কোন ক্ষতি নেই। বরং গরম হলে তুবড়ি ছুটবে ভালো বলে একটু তাতাতেই চাই। কিন্তু তাতাতে গিয়ে তেতো না হয়ে যায় সেটাও খেয়াল রাখা চাই।

ঘনাদার একটু যেন সেরকম ভাবগতিক দেখে গৌরকে একটু তাড়া দিতে হল।

—প্যাঁচটা কি কেষ্ট ঠাকুরের? পাঁচ গাঁয়ের প্রত্যেকটিতে পান্ডব-ভবন বসিয়ে পান্ডবদের কীর্তিকাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো?

উঁহুঃ!!—গৌর একেবারে কৌটিল্য সেজে বললে,—করিডর দাবি।

করিডর দাবি?—আমরা যথাবিহিত আর যথোচিত হতভম্ব।

হ্যাঁ, করিডরই—গৌর বিশদ হল,—আয়ুব খাঁ যেমন তখনকার পুব পশ্চিমের দুই পাকিস্তানের মধ্যে করিডরের কথা ভেবেছিলেন, সেই-রকম করিডর দাবি করা পাঁচ-ভাইয়ের পাঁচ রাজ্যের মধ্যে। দুর্যোধন সস্তায় সারবার লোভে পাঁচ গাঁ দেবার প্রস্তাবে রাজী হলেই জম্বু-দ্বীপ এফোঁড় ওফোঁড় করা এই পাঁচ করিডরের ঠেলাতেই কুপোকাত হতেন। শ্রীকৃষ্ণের লুকোনো প্যাঁচটি ধরে ফেলেই বিনা যুদ্ধে ছুঁচের ডগার জমিও দেব না বলে তিনি তম্বি করেছিলেন সেটা তাঁর ভুল নয়। দুর্যোধনের ভুল হল ওই এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য।

তার মানে?—গৌরকে কড়া গলায় জেরা করতে হল,—ওই অত সৈন্য যোগাড় করাই দুর্যোধনের ভুল তুমি বলতে চাও।

হ্যাঁ, দারুণ ভুল!—গৌর তার সিদ্ধান্তে অটল,—ওই অত সেনাদের সামলানো কি সোজা কথা! তখন ত আর রেডিও ছিল না, টেলিফোনও নয়। শুধু তুরী ভেরী বাজিয়ে দরকারের সময় ঠিক মত কাউকে কি পাওয়া যায়। ধনুর্ধারী বাহিনীকে চাইলে জগঝম্প বাজিয়েরা এসে কান ঝালাপালা করে। অত অগুনতি সৈন্যে বেসামাল হয়েই দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রে কাবু। তাই না ঘনাদা?

না।—বলে একটি প্রচন্ড ধমক শোনবার জন্যে ঘনাদার দিকে উৎসুক ভাবে চাইলাম।

তাঁকে এতক্ষণ কিউ-এ দাঁড় করিয়ে রাখার শোধ কেমন করে তিনি নেন তাই দেখবার জন্যেই ত এত তোড়জোড়।

কিন্তু এ কি হল? দুমফটাস্ করে যা ফাটবে তা যে শুধু একটু ফুস্ করল মাত্র!

একদিক দিয়ে তা অবশ্য বলা যায়!—আমাদের যেমন হতাশ তেমনি হতভম্ব করে ঘনাদা গৌরের কথাতেই সায় দিলেন যে!

শুধু কি সায়! সেই সঙ্গে গৌরের তরফে নজিরও হাজির করে যেন হাতের খবরের কাগজের মত পড়ে গেলেন—মিলিটারি রেকর্ডে ত পাচ্ছি, হস্তিনানগরে ধরেনি বলে শুধু পঞ্চনদে নয়—সমস্ত কুরু জাঙগাল, রোহিতকারণ্য, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙগাকুল, বারণ, বাটধান, সামুন পর্বত পর্যন্ত তাদের চালান করা হয়েছে।

কুরুক্ষেত্রের মিলিটারি রেকর্ডে তাই আছে বুঝি?—আমরা হতাশ হয়ে ঘনাদার দিকে তাকিয়ে বললাম—তাহলে ওই এগার অক্ষৌহিণীই দুর্যোধনের কাল হয়েছে বলতে হবে!

হ্যাঁ, তাই হত।—ঘনাদা গলাটায় যেন একটু বাঁকা সুর দিয়ে বললেন,—যদি—

যদি?—আমরা যেন মৃতসঞ্জীবনীর কৌটায় চাঙগা হতে হতে বললাম,—যদি কি?

যদি, গুণতিটা ঠিক হত।—ঘনাদা হাতের শেষ করা সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে চেপে ধরে বললেন।

আর কি কিছু আমাদের ভুল হয়!

তাঁর ফুরোন সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ঘষে নেভানো হতে না হতে শিশির তার নতুন টিনটা খুলে সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলে,—গুণতিতেই ভুল আছে বুঝি? এগার অক্ষৌহিণী নয়?

ঘনাদা শিশিরের টিন থেকে নতুন সিগারেট নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের ওপর ঠুকতে ঠুকতে একটু নাসিকাধ্বনি

করলেন মাত্র। শিশির ততক্ষণে লাইট জেবলে সামনে ধরেছে।

সিগারেটটা মুখে নিয়ে সেই লাইটারের আগুনে ধরিয়ে একটানেই এক রাঁশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘনাদা অবজ্ঞাভরে বললেন,—মেরে-কেটে আট অক্ষৌহিণী হলেও যথেষ্ট!

তাহলে?—আমরা পালা করে বিস্মিত জিজ্ঞাসা চালালাম।

ওই যে এগার অক্ষৌহিণী বলে লেখা?—আমি বিস্ময়ে মুখ-ব্যাদান করলাম।

সে লেখার তাহলে কোন দাম নেই!—শিবু হাঁ হল!

মাত্র আট অক্ষৌহিণী তাহলে এগার বলে চালু হল কি করে?—গৌরের সোজাসুজি প্রশ্ন।

সেই সঙ্গে শিশিরের ছোট্ট একটু টিপ্পনী—দুর্যোধনের হাম-বড়াই নিশ্চয়!

না, দুর্যোধনের হামবড়াই নয়।—ঘনাদা শিশিরকেই আগে জবাব দিয়ে আর এক রাশ ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁর মোক্ষম সম্মোহন শর কয়টি ছাড়লেন,—আট অক্ষৌহিণী এগার হওয়ার মূলেই আছে দুর্যোধনের সর্বনাশা ভুল,—যার নাম হল উলূক।

উলূক? এবার আমাদের আর অবাক্ হবার ভান করতে হল না।

হ্যাঁ, উল্লুক নয়—উলূক!—ঘনাদা বিশদ হলেন।—তবে নামটা যে একদিন ওই গালাগাল হয়ে উঠবে ভারত-বীর ভগদত্ত শাপ দিয়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী তখনই করে গিয়েছিলেন।

এই উল্লুক থুড়ি উলূকই হল দুর্যোধনের ভুল?—আমরা আঁচটা পড়তে না দেবার জন্যে উসকে দিয়ে বললাম,—যে কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের হারের মূল? কে ইনি?

ইনি কে জানো না!—ঘনাদা খুশী হয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূর করলেন—ইনি হলেন স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধী, দুর্যোধনের মাতুল স্বনামধন্য শকুনির ছেলে। বাপের চেয়ে এক কাঠি সরেস। ছোকরা খুব চটপটে চালাক চতুর, চোখে মুখে খই ফোটে বলে এই মামাত ভাইটিকে দুর্যোধনের খুব পছন্দ। পান্ডবদের কাছে তাকেই পাঠিয়ে-ছেন দূত করে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে দ্বারকায় পর্যন্ত দৌত্য করতে গেছে এই উলূক।

দৌত্য করতে গিয়ে সব গুবলেট করেছিল বুঝি উল্লুকটা থুড়ি ওই উলূক!—সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে শিবু।

উঁহু!—মাথা নাড়লেন ঘনাদা,—এ পক্ষে ও পক্ষে কথা যা চালা-চালি করেছে তা একেবারে যেন টেপ রেকর্ডারের মত। একটি কোথাও

ভুলচুক নেই।

তবে?—আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা—উলূককে নিয়ে দুর্যোধনের ভুলটা কোথায়?

ভুল—ঘনাদা এবার বোঝালেন—তার দৌত্যের বাহাদুরী দেখে তাকে যুদ্ধের কমিশেরিয়াটের মাথায় বসিয়ে দেওয়া—উলূক এইটেই চেয়েছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই সে রীতিমত গুছিয়ে নিয়ে তার নিজের দেশ গান্ধারে যা পাঠালে তাতে কৌরব পাণ্ডব যে পক্ষই জিতুক তার কিছু আসবে যাবে না। পায়ের ওপর পা দিয়ে অমন সাতপুরুষ তার সুখে কাটিয়ে দিতে পারবে।

তার মানে চুরি করেছিল উলূক?—আমরা স্তম্ভিত,—কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ করবার আগে অত চুরি করল কি করে?

কি করে আবার?—ঘনাদা ঈষৎ হাসলেন।—স্রেফ ওই গুণতির ফাঁকিতে। দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করতে এক এক রাজা তাঁর দলবল আর লটবহর নিয়ে আসেন আর উলূক খাওয়া থাকার ব্যবস্থা থেকেই মোটা রোজগারের ব্যবস্থা করলেন। বেশী কিছু ঝামেলা ত নয়, শুধু একটা দুটো শূন্য বাড়িয়ে যাওয়া। এক অক্ষৌহিণী কিসে হয় জানো ত? পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, রথ আর হাতী নিয়ে মোট দু'লক্ষ আঠারো হাজার সাতশ সেনায় এক চতুরঙ্গ। পুরো চতুরঙ্গ হবার ত দরকার নেই উলূকের কাছে। এখানে একটা ওখানে একটা শূন্য বসিয়েই সে অক্ষৌহিণী পুরো করে দিয়ে তাদের খানাপিনা তোয়াজ তদ্বির বাবদ দুর্যোধনের খাজাঞ্চিখানা ফাঁক করবার ফিকির করে নেয়, সামনাসামনি রাখলে পাছে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের মত ধুরন্ধর সেনাপতিদের চোখে ধরা পড়ে যায় বলে জায়গার অভাবের ছুতোয় উলূক যত দলকে পারে পাঠিয়ে দেয় দূর-দূরান্তরে।

ঘনাদা একটু থামতে তাঁর এ ব্যাখ্যানের একটু খুঁত ধরতেই হল। —তা উলূকের এই চুরির জন্যে, কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের হার হয়েছিল বলতে চান?

পাগল!—ঘনাদা অবজ্ঞাভরে প্রতিবাদ জানালেন,—ও চুরি ত দুর্যোধনের খাজাঞ্চিখানায় একটা বড় গোছের ফুটোও করতে পারেনি। ও চুরির ওপর উলূক যদি হস্তিনাপুরের সব ক'টা পুকুর মায় কুরুক্ষেত্রের দ্বৈপায়ন হ্রদটাও চুরি করে পাচার করত কৌরবেরা তাতেও কাবু হত না।

তাহলে কাবু তারা হল কেন?—আমরা যুক্তি দেখালাম,—গুণতির ফাঁকি-টাকি সব বাদ দিয়ে ধরেও দুর্যোধনের পক্ষে মোটমাট আট

অক্ষৌহিণী ত ছিল। পাণ্ডবদের চেয়ে পুরো এক অক্ষৌহিণী বেশী। তাতে তাদের হার হওয়া কি উচিত?

কখনো নয়। তবু হার হল কেন?—নিজেই প্রশ্ন তুলে ঘনাদা তার উত্তর দিলেন,—হার হল উলুকের চুরির দরুন নয়, তার মুখ্খু মাতব্বরীতে। একাই গাণ্ডিবী অর্জুন সমেত পাঁচ ভাই পাণ্ডবকে যিনি কুপোকাত করতে পারতেন সেই বীরের সেরা বীরকেই উলুক দিয়েছে ক্ষেপিয়ে। নেহাৎ এক কথার মানুষ বলে দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্যে চলে যেতে আর পারেননি। তবে নিজের যা বড় মূলধন তার অর্ধেকই দিয়েছেন দেশে পাঠিয়ে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শুকনো ন্যাড়া পাহাড়ের দেশ গান্ধারের ছেলে উলুক, ওই বীরের সেরা অতিরথ বীরের মর্ম সে আর কি জানবে।

কাজকর্মের পর সন্ধ্যেয় ইয়ারবন্ধুর কাছে ওই বীরের সেরা বীরকে নিয়ে সে ঠাট্টা-তামাশাই করেছে।

ইয়ারবন্ধু তার অবশ্য হেঁজিপেঁজি কেউ নয়। দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ, দুঃশাসনের ছেলে বৃহদ্বল, কর্ণের ছেলে বৃষসেন, এদের কাছেই ঠাট্টা করে নাক সিঁটকে সে বলেছে,—কি সব মাল যে এই যুদ্ধের টানে আমদানি হচ্ছে হস্তিনাপুরে! আজ এক চীজ্ এসেছিলেন আমাদের কৌরবপক্ষকে কৃতার্থ করতে! জিভের এখনো আড়ই ভাঙেনি। সমস্তকে বলে হমস্ত। চোর বলতে বলে চুর, আর সঙ্গে যাদের এনেছে প্রায় অর্ধেক হস্তিনানগরই চায় তাদের থাকার জন্যে।

বৃষসেন বাদে অন্য সবাই এ কথায় উলুকের সঙ্গে হেসে উঠেছে। কর্ণের ছেলেই একটু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে—মানুষটা নিশ্চয় পূর্বী। পূর্বীদের উচ্চারণ এমনি একটু বাঁকা হয়। কিন্তু তাতে হাসবার কি আছে। ওরা উচ্চারণ যেমনি করুক, যুদ্ধ যা করে দেখলে চোখ টেরা হয়ে জিভ এড়িয়ে যাবে তোমারও। মানুষটা কোথাকার বলো ত? মনে আছে তার দেশটার নাম?

আছে, আছে!—তাচ্ছিল্য ভরে বলেছে উলুক,—ওই পূব সীমান্তের প্রাগজ্যোতিষপুর না কি যেন বললে।

প্রাগজ্যোতিষপুর!—চমকে উঠে বলেছে বৃষসেন,—সেখানকার ভগদত্ত নয় ত?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভগদত্তই যেন বলছিল নামটা।—উলুক অবজ্ঞাভরেই বলেছে,—যা কথাবার্তার ধরন আর উচ্চারণ, ভালো করে বুঝতেই পারিনি। তাছাড়া তোমার এই ভগদত্ত সঙ্গে করে কি এনেছেন

জানো? একটি দুটি নয়, শ'দুয়েক এক হাতির পাল। সেই হাতির পালের জন্যে জায়গা দিতে হবে শুনে বলেছি—অত হাতির আমাদের কিচ্ছু দরকার নেই।

তুমি তাই বললে?—উলূকের দিকে তাজ্জব হয়ে চেয়ে হতাশ সুরে বলেছে বৃষসেন,—প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্তকে তুমি বললে যে তার হাতিতে আমাদের দরকার নেই! তা তুমি গান্ধারের নীরস ন্যাড়া পাহাড়ের গাধা আর অশ্বতরই চেনো, পুব মুলুকের বিশেষ করে প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্তের হাতির দাম আর তুমি কি করে জানবে। ভগদত্তের কথা ছেড়েই দাও, তার ওই এক একটা হাতি প্রায় আধা অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গ সেনার সমান তা জানো!

খুব জানি! খুব জানি!—উলূক ব্যঙ্গের সুরে বলেছে, ও পূর্বিয়াদের দৌড় আমার খুব জানা আছে! নিজেদের বনজঙ্গলে সবাই ওরা খুব বাহাদুর। এখানে লড়াই-এর দুটো হাঁক শুনলেই দাঁত ছিরকুটিয়ে ভির্মি যাবে। ওই মালেদের এক পাল হাতি পুষতে আমি রোজ রোজ এক জঙ্গল করে খোরাক যোগাতে পারব না।

উলূক অতিরথ ভগদত্তের কোনো খাতির গোড়া থেকেই রাখেনি। প্রথম দিনই ভগদত্ত অতি কষ্টে নিজেকে সামলেছেন। তিনি যে কে তা ওই একটা চ্যাংড়া ছোকরা জানবে কোথা থেকে! ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের ভেতর সেরা যারা, তদের বলে রথ, রথের ওপর হল মহারথ। যেমন দ্রোণাচার্যের ছেলে অশ্বত্থামা, জরাসন্ধ। এই মহারথদের ওপর যাঁরা তাঁরা হলেন অতিরথ, যেমন ভীষ্ম দ্রোণাচার্য অর্জুনের মত প্রাগ-জ্যোতিষপুরের ভগদত্ত। এই অতিরথ ভগদত্তের মত মানুষকে চিনে যোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দুর্যোধনের পয়লা নম্বর হুঁশিয়ার পাকা লোক রাখা উচিত ছিল।

ভগদত্ত ত যুদ্ধের নামে রাজধানী হস্তিনাপুরটা একটু বেড়িয়ে যেতে আসেননি। যুদ্ধ করা কাকে বলে তিনি কুরু-পান্ডব দুই পক্ষকে দেখিয়ে দিতে এসেছেন। তা দেখাতে শুধু হাতে আসবেন কেন? সঙ্গে যা এনেছেন দরকার হলে একাই তাতে বুঝি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফয়সালা করে দিতে পারেন।

আমাদের কাশীরাম দাস ত সে সৈন্যসামন্তের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া বহর বোঝাতে অঙ্ক-টঙ্কই সব গুলিয়ে ফেলেছেন—

ভগদত্ত রাজা আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
অর্বুদ অর্বুদ সৈন্য করিয়া সাজন॥

সহস্র শতেক কোটি অশ্ব আসোয়ার।
ষষ্ঠী-কোটি মহারথী তার পরিবার॥
ছত্রিশ সহস্র কোটি সঙ্গে মত্ত হাতি।
চতুরঙ্গ দল সহ আসে নরপতি॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কাঁপে মহীধর।
মিলিত হইল কুরু সৈন্যের ভিতর॥

মিলিত হওয়া আর হল কই! প্রথম থেকেই উলূকের সঙ্গে খটাখটি।

দপ্তরে বসে ভারিক্কী চালে জাবদা খাতা খুলে টুকতে টুকতে মুখ না তুলেই বলেছে,—কি নাম? ভগদত্ত। ঠিকানা? প্রাগজ্যোতিষপুর। সঙ্গে লটবহর লোকজন কত?

অতিরথ ভগদত্ত তখনই রাগে ফুলছেন। তবু নিজেকে সামলে উত্তর যা দিতে গিয়েছেন তার ক'টা শব্দ উচ্চারণ করতে না করতেই উলূক খাতায় চোখ রেখেই ক'টা টিক মারতে মারতে বলেছে—যান, চলে যান যামুন পর্বতে।

যামুন পর্বতে কেন?—ভগদত্তের গলা তখনও নামানো,—যুদ্ধ করতে এসেছি কুরুক্ষেত্রে, যামুন পর্বতে যাব কোন্ দুঃখে!

যামুন পর্বত পছন্দ না হয় চলে যান রোহিতকারণ্যে।—উলূক তখনও মুখ তোলেনি,—অঢেল জায়গা পড়ে আছে।

অঢেল জায়গার লোভে ত আসিনি,—ভগদত্ত কোন রকমে নিজের ওপর রাশ টেনে বলেছেন,—অঢেল জায়গার অভাব আমার দেশে নেই। আমি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছি। এখানেই কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা চাই।

মনে মনে ভগদত্তের উচ্চারণের খুঁতগুলোতে মজা পেলেও মানুষটার জেদের দাবিতে তখন বিরক্ত হয়ে উঠেছে উলূক। জাবদা খাতায় কি লিখতে লিখতে মাতব্বরী চালে যেন হুকুম শুনিয়েছে,—কাছাকাছি কোথাও হবে না। এখানে বড় ভিড়। হয় যামুন পর্বত নয় রোহিতকারণ্যে যেতেই হবে।

না।

এবার চমকে উলূককে মুখ তুলতে হয়েছে। হঠাৎ এই বাজ পড়ার আওয়াজ যিনি গলা থেকে বার করতে পারেন, দেখতেও হয়েছে সে মানুষটাকে একটু মন দিয়ে।

হ্যাঁ, বাজের আওয়াজ বার করবার মতই যে চেহারা তা স্বীকার করতে হয়েছে মনে মনে। লম্বা চওড়া তেমন নয়, কিন্তু একেবারে

যেন লোহা পিটিয়ে গড়া। মুখের দিকে চাইলে ত একটু শিউরে উঠতেই হয়। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বার হচ্ছে।

উলূক আর তর্কাতর্কি করেনি। হস্তিনানগরের কাছেই জায়গা দিয়েছে প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্তকে। কিন্তু সে জায়গায় তাঁর সৈন্য-সামন্ত আর হাতির পাল নিয়ে কুলোবে কেন?

বিরক্ত হয়ে ভগদত্ত তাঁর সেরা এক কুড়ি হাতি ফেরতই পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রাগজ্যোতিষপুরে।

উলূক একদিকে হার মানতে বাধ্য হলেও এ হারের শোধ নিয়েছে আর এক দিকে। হাতে না মারতে পেরে ভাতে মেরেছে বলা যায়। ভগদত্তের সেই সব মত্ত মাতঙ্গের খোরাক দিয়েছে যেন ঘোড়ার মাপে।

এই নিয়ে ভগদত্তকে প্রায় রোজ আসতে হয়েছে উলূকের কাছে নালিশ জানাতে।

শকুনির ছেলে উলূক এখন ভগদত্তের সামনে যেন ননীর মত নরম। হাত জোড় করে নালিশ শুনে তার অনুচরদের লোক-দেখানো গালাগাল দেয়, কিন্তু হাতিদের খোরাকের ব্যবস্থা থাকে যথাপূর্বম্।

ভগদত্ত শেষে একদিন তাই আগুন হয়ে উঠে শাপ দিয়েছেন উলূককে,—তোমার জন্যে যমদূতেরা ত নরকের দরজা খুলেই রেখেছে, তোমার নামটাকে আমি অভিসম্পাত দিয়ে গেলাম। যুগ যুগ বাদেও এ নামটা লোকের মন থেকে মুছে যাবে না, গালাগাল হয়ে থাকবে মানুষের মুখে।

ও!—আমরা যথারীতি বিস্মিত হয়ে বললাম,—ও! উলূকই হয়েছে উল্লুক!

হ্যাঁ,—ঘনাদা মুখটাকে যেন করুণ করে এবার বললেন,—কিন্তু উল্লুক না উলূক যাই বলো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটার পরিণাম ওলট-পালট হয়ে যাবার মূল হল সে-ই। তাকে তোমরা যাকে বল কমিশারিয়েট, সেখানে বসাবার মত ভুল যদি দুর্যোধন না করতেন তাহলে কোথায় থাকে পাণ্ডবদের জারিজুরি। পাঁচ ভাই পাণ্ডবের মধ্যে যিনি মধ্যমণি সেই গাণ্ডিবী অর্জুনই টেঁসে যান সবার আগে।

ওই উল্লুক, থুড়ি উলূক সৈন্যসামন্তদের তদ্বির তদারক আর খানাপিনার সেরেস্তাদার হয়েছিল বলে স্বয়ং অর্জুনের নির্ঘাত মৌতের ফাঁড়া কেটে গেল।

ঘনাদার কাছ থেকেও এতটা বাড়াবাড়ি হজম করা যে একটু শক্ত, গলায় তার সুরটা একেবারে গোপন রাখলাম না।

কিন্তু ঘনাদা নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু! রীতিমত জোর দিয়ে

বললেন,—তাই ত গেল। ভগদত্তের সৈন্যসামন্ত আর হাতির পালের কথাই শুনেছ, সে কি রকম লড়িয়ে তা আর কতটুকু জানো। কাশীরাম দাস ত বর্ণনা দিতে গিয়েই হার মেনে শুধু লিখেছেন,

—অতি ক্রোধে ভগদত্ত করয়ে সংগ্রাম।
লিখনে না যায় তার যুদ্ধ অনুপম॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে চক্ষের নিমেষে।
ভগদত্ত যুদ্ধ দেখি দুর্যোধন হাসে॥
পান্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহা ভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির॥

এ ত কাশীরাম দাসের তিন হাত ফেরতা বিবরণ! আদি মূল মহাভারতেই কি লিখেছেন শোনো—এইরূপে গজারোহী মহাবাহু ভগদত্ত পান্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

গোপাল বনমধ্যে দণ্ড দ্বারা পশুগণকে যেরূপ তাড়িত করে মহাবীর ভগদত্ত তদ্রূপ পান্ডব সৈন্যগণকে বারবার তাড়িত করিতে লাগিলেন।

এ ভগদত্তকে ভয় করে না কুরুক্ষেত্রে এমন কেউ নেই। ধনঞ্জয় অর্জুন নিজেই স্বীকার করেছেন,—মহাবীর ভগদত্ত গজযান বিশারদ ও পুরন্দর-সদৃশ। উনি এই ভূমন্ডলে গজযোধীগণের প্রধান। উহার গজের প্রতিগজ নাই। ওই গজ কৃতকর্মা জিতক্লম এবং অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শ সহনক্ষম। অদ্য ওই হস্তী একাকী সমুদয় পান্ডব সৈন্য সংহার করিবে।

শুধু পান্ডব সৈন্য নয় স্বয়ং অর্জুনেরও মরণ বাণ ওই ভগদত্তের হাতে।

ঠিক ঠিক!—গৌর বিদ্যে জাহির করবার সেই মৌকাটা ছাড়তে পারল না,—ভগদত্তের সেই বৈষ্ণবাস্ত্র কেমন! কিন্তু সে অস্ত্র ত শ্রীকৃষ্ণ নিজের বুক দিয়ে ঠেকিয়ে বৈজয়ন্তীমালা বানিয়ে ফেললেন।

বানিয়ে ফেললেন আবার কোথায়?—ঘনাদা প্রায় ধমকই দিলেন আমাদের,—সে অস্ত্র বজ্র হয়ে পড়তে গিয়ে আলোর মালাই হয়ে গেল আকাশে! কিন্তু কেন? ভগদত্তের অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্রের ও দশা হল কেন?

আমরা নির্বাক্। কারুর মুখে আর কথা নেই।

ঘনাদা নিজের জিজ্ঞাসার জবাব নিজেই দিলেন—এ ভেস্তা বৈষ্ণবাস্ত্রের মূলেও দুর্যোধনের সেই ভুল—উলূক। তাঁর হাতিদের ন্যায্য খোরাক না দিতে পেরে ভগদত্তের কিছুদিন থেকেই মেজাজটা খুব খারাপ। যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিয়ে দেশে ফেরার জন্যে তাই তিনি অস্থির। সেই মতলবেই ক'দিন থেকে রোজ তিনি উলূককে ক'টা জিনিস আনিয়ে দেবার জন্যে তাগাদা দিচ্ছেন। তিনি নিজে হস্তিনার বাজারে জিনিসগুলোর সরেস নমুনা পাননি বলেই অন্য কোনো শহর থেকে সেগুলো আনিয়ে দেবার জন্যে উলূককে এই ফরমাস। উলূক কিন্তু যেন গা-ই দেয় না। তাঁর কথায়। দু-চারটে নমুনা যা এনে তাঁকে দেখিয়েছে ভগদত্ত তা দেখেই হস্তিনার বাজারেরই রদ্দি মাল বলে চিনে বাতিল করলেন। হস্তিনার বাজারে রদ্দি ছাড়া কোনো মাল কেন নেই এই বিষয়েই কোনো সন্দেহ শুধু তার মাথায় আসেনি। সত্যের খাতিরে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে বাজারের সরেস মাল উধাওর ব্যাপারে উলূকের কোনো হাত ছিল না। অন্য শহরে গিয়ে সওদা করে আনার দায়টুকু শুধু সে নেয়নি, আর গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত হস্তিনার বাজার থেকে যে রদ্দি মাল এনে দিয়েছে, নিরুপায় হয়ে ভগদত্তকে কাজ সারতে হয়েছে তাই দিয়েই।

সেই জন্যেই বজ্র হয়ে যার নামবার কথা অব্যর্থ সে বৈষ্ণবাস্ত্রের ওই দশা। হাউইটজার হয়ে ছোটার বদলে আকাশে হাউই-এর তারা-বাজি। বাসুদেব সত্যিই গলায় পরুন বা না পরুন তাঁর নামে গল্পটা ভালোভাবেই রটেছে যুগের পর যুগে।

ঘনাদা নেমে শিশিরের সিগারেটের টিনটা হাতিয়ে উঠে যাবার উপক্রম করতেই আমাদের এবার তাঁকে ধরে থামাতে হয়েছে।

রদ্দি মসলার জন্যেই কি ভগদত্তের বৈষ্ণবাস্ত্রের ওই দুর্দশা?—আমার প্রশ্ন।

মসলাগুলো কি?—গৌরের কৌতূহল।

হস্তিনার বাজার থেকে সরেস মসলা সব উধাও হয়ে রদ্দি মালই শুধু রইল কেন?—শিবুর সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

মসলাগুলো হল সোরা, গন্ধক আর চিনি,—ঘনাদা সংক্ষেপে তাঁর জবাব সেরেছেন,—মসলা বাজে হওয়ায় কামানের বারুদের কাজ না হয়ে তাতে শুধু তারাবাজির হাউই-ই উড়েছে, আর বৈষ্ণবাস্ত্রের মসলা জেনে তা ভন্ডুল করবার জন্যে স্বয়ং কেশব বাসুদেবই বাজার থেকে সব সরেস মাল আগে থাকতে সরিয়ে ফেলেছেন।

শ্নুন! শ্নুন ঘনাদা!

আরো অনেক প্রশ্ন তখন আমাদের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে সেগুলোর জবাবের জন্যে ঘনাদাকে বৃথাই আকুলভাবে ডেকেছি।

ঘনাদা ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর টঙের ঘরে। শিশিরের সিগারেটের টিনটা নিয়ে অবশ্য।

খাণ্ডবদাহে ঘনাদা

না, নেই!

বাজখাঁই গলাটা শিশিরের। তবে শুধু আমাদের আড্ডাঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থাকবার জন্যে নয়, বাহাত্তর নম্বরের সব ক'টা তলা ছাড়িয়ে বনমালী নস্কর লেনে বাঁক পর্যন্ত পৌঁছোবার মত।

গলাটা অত চড়াবার অবশ্য দরকার ছিল না। তেতালার টঙের ঘরে যাবার ন্যাড়া সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছোবার মত হলেই চলত। কারণ সেখানে তালতলার চটিজোড়ার পেটেণ্ট আওয়াজ শোনামাত্রই পালাটা শুরু করা হয়েছে।

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের টঙের ঘরে যাবার ন্যাড়া সিঁড়িতে তালতলার চটির আওয়াজটা যে কার পায়ের তা নিশ্চয় কাউকে বলে দিতে হবে না।

আওয়াজটা ঘনাদারই পায়ের, আর উঠতি নয় নামতি। মানে ঘনাদা তার টঙের ঘর থেকে নেমে আসছেন। আসছেন মানে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। না এসে যাবেন কোথায়? দুদিন ধরে প্ল্যান করে সেই ব্যবস্থাই করেছি। মাছের জন্যে যেমন চার ফেলা, তেমনি তাঁকে টঙের ঘর থেকে টেনে বার করে আনার জন্যে সকাল থেকেই গন্ধ ছড়ানো হচ্ছে বাতাসে।

প্রথমেই সকাল সাতটা না বাজতে বাজতে নীচের রসুই ঘরে রামভুজের তেলের কড়ায় ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে কি যেন ভাজার শব্দ।

সে শব্দ যদি তেতলা পর্যন্ত না পৌঁছোয়, যা ভাজা হচ্ছে তার সুবাস গোটা বাড়ি ত বটেই, ছাদ ডিঙিয়ে পাশের বাড়ির মানুষের জিভেও জল না ঝরিয়ে ছাড়বে না।

সে হিঙের কচুরির মোহিনী সুরভিতে যদি কাত না হন, তার পরেই পাড়া আমোদ করা চাকাচাকা গঙ্গার ইলিশ ভাজার গন্ধ।

হিঙের কচুরির সঙ্গে ইলিশ ভাজা কি রসে রুচিতে মেলে?

মিলুক না মিলুক কার্যোদ্ধার হওয়া নিয়ে কথা। তা যে হয়েছে ন্যাড়া সিঁড়িতে চটির আওয়াজেই ত বোঝা যাচ্ছে। নীচে থেকে এসব

গন্ধ তাঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে অথচ বনোয়ারীর চুলের টিকিও দেখা যাচ্ছে না ওপরের ছাদে, এ যন্ত্রণা কতক্ষণ আর সহ্য হয়!

আমাদের গণনা মত ঘনাদাকে নিজেই একবার তাই সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে নামতে হচ্ছে।

তাঁর নেমে আসার খবর জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দোসরা চাল সুরু। সে চাল হল শিশিরের ওই পাড়া কাঁপানো গলায়—না, নেই।

নেই? গৌরের পাল্লা দেওয়া গলার প্রতিবাদ,—মহাভারতে খাণ্ডবদাহের ঠিক বিবরণ নেই? শোন তাহলে,—

শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল, উঠে পর্বত আকার॥
কৃষ্ণার্জুন দুই দিকে রহে দুই জন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দের হুতাশন॥
প্রলয়ের মেঘ যেন, শুনি গড়গাড়।
নানা জাতি বৃক্ষ পোড়ে শুনি চড়বড়॥
নানাজাতি পশু পোড়ে নানা পক্ষিগণ।
নানাজাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ॥

গৌর এ পর্যন্ত আওড়াবার মধ্যেই ঘনাদা আড্ডাঘরে পৌঁছে যান। দরজা থেকে ভেতরে আসবার মধ্যেই সবাই আমরা দাঁড়িয়ে উঠে নিঃশব্দে অভ্যর্থনা জানাই তাঁর মৌরসী আরাম কেদারাটা ওরই মধ্যে একটু ঝাড়ামোছার ভান করে এগিয়ে দিয়ে।

ঘনদা সে কেদারায় যথারীতি গা এলিয়ে দেওয়ার পরও আমাদের পালা-কীর্তন কিন্তু থামে না। এতক্ষণ ধরে সব কিছুর মধ্যে তা সমানে চলে এসেছে। গৌর তার আবৃত্তি শেষ করতে না করতে শিবু পয়ার থেকে ত্রিপদীতে নামার ভূমিকা করে বলেছে,—শুধু ওই খাণ্ডবদাহ ঠেকাবার জন্যে যুদ্ধটার কথা কি ভুলে যাব নাকি? সবক'টি দেবতা আর চর অনুচর নিয়ে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন খাণ্ডব বন বাঁচাতে।—

এই মত গুটিগুটি দেবতা তেত্রিশ কোটি
গেল বন রক্ষার কারণে।
আইল গরুড় পক্ষী সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণে।



যক্ষরক্ষ ভূতদানা সহ নিজ নিজ সেনা
নানা অস্ত্র শেল শূল লৈয়া।
এমত লিখিব কত ত্রিভুবন আছে যত
রহে সবে আকাশ জুড়িয়া।
তবে দেব পুরন্দরে আজ্ঞা দিল জলধরে
বৃষ্টি করি নিবায় অনল।
আজ্ঞামাত্র অতি বেগে সম্বর্তাদি চারি মেঘে
মুষল ধারায় ঢালে জল।
প্রলয় কালের বৃষ্টি যেন মজাইতে সৃষ্টি—
শিলা জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে ঝনঝনা ঘন পড়ে
তিন লোকে লাগিল তরাস।
দেখি পার্থ মহাবল না পড়িতে বৃষ্টি জল
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে শোষকে সলিল শোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ ওড়ে॥

গৌর শিবুর চেয়ে আমি-ই বা কম যাই কেন? শিবু দম নিতে একটু থামতেই আমি একেবারে মূল মহাভারত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম,—আদি মহাভারতে স্বয়ং ব্যাসদেব কি বলে গেছেন জানিস? বলে গেছেন—ভগবান হুতাশন সপ্ত শিখা বিস্তার করিয়া চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া খান্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকাল যুগান্ত কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।...

গুল!—শিশির বাধা দিয়ে মাতব্বরী চালে বললে,—গুল না হলে বেবাক ভুল!

শিশিরের এই টিপ্পনীই করবার কথা। কিন্তু আমাদের রিহার্সেল দেওয়া সিনেরিও মত আমায় কথাটা শেষ করতে দেওয়া উচিত ছিল না কি! আর দুটো লাইন মাত্র বলাটুকুর তর সইল না!

তখখুনি ঘনাদার সামনে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে খান্ডবদাহ পালার ভুষ্টিনাশ করে দিতে ইচ্ছে করে কি না?

তবু নিজের মহানুভবতায় রাগটা সামলে পরের সংলাপটা সিনেরিও মাফিক-ই বললাম।

গুল! গুল না হলে ভুল? মহাভারতের? কি বলছ কি?

ঠিক কথাই বলছি।—শিশির যেন তুরীয়লোক থেকে বললে,—

মহাভারতে কি ভুল কোথাও নেই?

তুমি যখন বলছ তখন আছে হয়ত!—আড় চোখে একবার ঘনাদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু ভুল বা গলদটা কি জানতে পারি?

তা পারো বই কি—শিশির যেন বাণী বিতরণের ভঙ্গিতে ঘনাদা-কেও টেক্কা দিয়ে বললে—খাণ্ডব বন জ্বালাতে নয়, তার আগুন নেভাতেই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে লেজে-গোবরে হতে হয়েছিল।

তার মানে খাণ্ডব বনে আগুন লাগাতে কৃষ্ণ আর অর্জুন সাহায্য করেননি? তাঁরা আগুন নেভাবার জন্যেই অস্থির হয়েছিলেন?

একেবারে যেন হাঁ হয়ে প্রশ্নটা শিশিরকেই করলাম বটে, কিন্তু চোখগুলো আমাদের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেওয়া ঘনাদারই দিকে।

কি করছেন কি ঘনাদা? এত রকম টোপ ফেলে তাঁকে নামিয়ে আনা, তার ওপর তাঁর মুখের সামনে তাঁরই দেখানো চাল চেলে এই সব বাজে বুকনির বেয়াদবি করা, এতেও ঘনাদা ক্ষেপে উঠবেন না? তাঁকে একেবারে চিড়বিড়িয়ে তোলবার জন্যে আয়োজনের কোন ত্রুটি ত কোথাও রাখিনি। আমাদের এই গা-জ্বালানো বাজে-বুকনির সঙ্গে নীচের রসুইঘর থেকে হিঙের কচুরি আর ইলিশ-ভাজার গন্ধটুকুই শুধু তাঁকে পেতে দিয়েছি, আসল মালের এখনো পর্যন্ত দেখাই মেলেনি।

এ সব জ্বালার ওপর খাণ্ডবদাহের এই নয়া ব্যাখ্যায় ঘনাদার ত নিজেরই আগুন হয়ে হুংকার দিয়ে ওঠবার কথা!

কিন্তু তার বদলে ঘরে ঢোকা মাত্র শিশিরের কৌটো খুলে বার করে ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটটি মৌজ করে টানতে টানতে তিনি যেন নির্বিকার হয়ে আমাদের কথা শুনছেন মনে হচ্ছে।

এ দিকে আমাদের কথার প্যাঁচের পুঁজি যে ফুরিয়ে এসেছে।

এতদূর পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই ঘনাদা তেতে উঠতে উঠতে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে আমাদের বেয়াদবির উচিত শিক্ষা দেবেন এই ছিল আমাদের হিসেব।

কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলা কোথায়, ঘনাদার একটু উষস গরম হবার লক্ষণও যে নেই।

শিশির ইতিমধ্যেই বেশ ফাঁপরে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে।

রিহার্সেল মাফিক আমাদের তখন একটু বাঁকা সুরে শেষ প্রশ্নটা ঝুলি থেকে ছাড়তে হয়েছে।

—জ্বালাবার বদলে কৃষ্ণ আর অর্জুন ত আগুন নেভাতে হন্যে হয়েছিলেন। খাণ্ডব বনে আগুনটা তাহলে লেগেছিল কেন?

কেন লেগেছিল?—জবাবের পুঁজি ফুরিয়ে ফেলে শিশিরের অবস্থা তখন কাহিল। হালে পানি না পেয়ে আমাদের জিজ্ঞাসাটাই আবার আউড়ে বললে,—কেন লেগেছিল জিজ্ঞাসা করছ!

হ্যাঁ, করছি।—কথার পিঠে খোঁচাটা দিতেই হল—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ ত আর বনের মধ্যে লুকিয়ে সিগারেট থুড়ি তামাক খাচ্ছিলেন না!

তামাক খাবেন কেন!—সুরটা চড়া হলেও শিশিরের গলায় তখন আর যেন জোর নেই—তামাক বলে কিছু তখন ছিল? ভারতে ত নয়ই, ইউরোপে এশিয়াতেও কেউ এ জিনিস জানত না।

শিশিরের এ বিদ্যে জাহিরের চেষ্টাতেও কিন্তু আসল সমস্যার সুরাহা কিছু হল না। আমরা শিশিরকে নাকাল করতে চাই না। কিন্তু যেমন করে হোক তর্কটাকে গরম রাখবার জন্যে শিশিরকেই না খুঁচিয়ে আমাদের উপায় কি?

থাক, তামাক নিয়ে আর জ্ঞান দিতে হবে না!—বলতেই হল আমাদের,—খাণ্ডব বনে আগুন কি করে লাগল, সেইটেই আগে শোনাও।

আগুন লাগল মানে—শিশির এবার তোৎলা হতে শুরু করেছে,—আগুন, কি বলে...বনে আগুন কি কখনো লাগে না?

নিশ্চয়ই লাগে!—আমরাও তখন জুতসই জবাব খুঁজতে দিশাহারা।

কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে আলাদা—বলে কোন রকমে খেইটা টেনে রেখে ঘনাদার দিকে চাইলাম। দৃষ্টিটা এবার সত্যিই অসহায় করুণ। সত্যি, হল কি ঘনাদার? এখনো তিনি নির্বিকার! আমাদের বেয়াদবির শোধ নেবার এমন মৌকা পেয়েও মুখ বুজে থাকবেন! এ ভারত যুদ্ধে সত্যিই অস্ত্রগ্রহণ করবেন না একেবারে?

আমাদের ত তাহলে নাকে খৎ দিয়ে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। নইলে ওদিকে হিঙের কচুরি আর ইলিশ ভাজা তপ্ত খোলা থেকে নেমে যে ক্রমশঃ জুড়িয়ে মিইয়ে যাবে।

মরিয়া হয়ে তাই সোজা ঘনাদাকেই মুরুব্বি মানলাম,—শুনেছেন ত ঘনাদা আজগুবী কথা! মহাভারতের গুল না ভুল বার করেছে শিশির!

কিন্তু কই, তাঁর সাড়া কই। ঘনাদার চোখ দুটো যেন একটু কোঁচকানো কিন্তু মুখ দিয়ে ত স্রেফ খানিকটা ধোঁয়াই ছাড়লেন!

আর কোনো আশা আমাদের নেই ভেবে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ অঘটন ঘটে গেল। ঘটল শিশিরেরই ডুবতে গিয়ে কুটো ধরার এক চালে।

আমরা যখন ঘনাদার মুখের দিকে আকুল হয়ে চেয়ে আছি তখন হঠাৎ বারান্দা থেকে তার বাজখাঁই গলা শোনা গেল,—বনোয়ারী রামভুজ! বলি, তোমরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ নাকি! খাবার-গুলো কি ভিজে ন্যাকড়া করে আনবে।

ব্যস, ওই ক'টা কথাতেই অমন ভোজবাজি হয়ে যাবে কে ভেবেছিল!

ঘনাদাকে আরাম কেদারায় হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসতে দেখা গেল।

তারপর আমাদের সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি মুখও খুললেন!

কিন্তু যা আশা করছিলাম সে বজ্রস্বর কোথায়? তার বদলে নরম গলায় যেন একটু আস্কারা দেওয়া জিজ্ঞাসা—শিশির খাণ্ডব-দাহের বৃত্তান্তটা বেঠিক বলছে, না?

তা গলাটা খাদেই হোক বা নিখাদে, আমরা ওই মুখ খোলা-টুকুতেই কৃতার্থ। আগুনের ওই ফুলকিটুকুই গনগনে করে তোলবার আশায় প্রাণপণে হাওয়া দিলাম।

শিশির তখন বারান্দা থেকে তার জায়গায় এসে বসেছে। তাকে প্রায় খুনের আসামীর কাঠগড়ায় তুলে কড়া নালিশ জানালাম,—শুধু বেঠিক কি! ও বলছে ভুল না হলে গুলও হতে পারে। কৃষ্ণ আর অর্জুন নাকি খাণ্ডব বনে আগুনই লাগায়নি!

তা, শিশির ভুল আর কি বলেছে!

একেবারে হাঁ হয়ে গিয়ে ঘনাদার দিকে তাকালাম। না, আমাদের শোনার কিছু ভুল হয়নি। কথাগুলো ঘনাদার মুখ থেকেই বেরিয়েছে।

কিন্তু, খাণ্ডববনে আগুন তাহলে লাগল কি করে?—হতভম্ব মুখে আগের মিথ্যে করে বানানো প্রশ্নটা এবার সত্যি করেই বললাম ঘনাদাকে।

উত্তর তখনই মিলল না। ঘনাদার চোখ তখন বনোয়ারী যেখান দিয়ে ঢুকছে সেই দরজার দিকে।

উত্তরের জন্যে একটু অপেক্ষা করতে হল তাই। একটু মানে, আলুর দম সমেত ডজন খানেক হিঙের কচুরি আর প্রায় ততগুলি ইলিশ ভাজার সদ্‌গতির পর বনোয়ারীর দেওয়া প্লেটটি চাঁছাপোঁছা

হয়ে যতক্ষণ না ঘনাদার কোল থেকে আবার সামনের টেবিলে নামল।

প্লেট নামিয়ে চায়ের পেয়ালাটা মুখে তোলবার পর নিজে থেকেই আমাদের প্রশ্নটা স্মরণ করে বললেন—কেমন করে খাণ্ডববনে আগুন লাগল জিজ্ঞাসা করছ? কেমন করে আর! অগ্নিদেব নিজেই আগুন লাগালেন নিজের গরজে।

মহাভারতেও ত তাই আছে—আমরা উৎসাহিত হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না। ঘনাদা তর্জনী আর মধ্যম আঙুলের মাঝে শিশিরের জ্বালিয়ে দেওয়া পরের সিগারেটটি ধরে বাধা দিয়ে বললেন,—ওইটুকুই মহাভারতে ঠিক আছে, তার বেশী নয়।

তার মানে?—আমাদের বিস্ফারিত চোখে বলতেই হ'ল—ইন্দ্রদেব মেঘের পাল নিয়ে বৃষ্টিতে আগুন নেভাতে আসেননি?

আসবেন না কেন?—ঘনাদা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ইন্দ্রদেবও বৃষ্টি নামিয়েছেন, কৃষ্ণার্জুনও সে বৃষ্টি উড়িয়ে দিয়েছেন অস্ত্রের কেরামতিতে, কিন্তু সে লড়াই ত আপোসের। তলায় তলায় ইন্দ্রদেবের সঙ্গে কৃষ্ণার্জুনের সড়্-ই ছিল ওই রকম।

ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ আর অর্জুনের সড়্!—আমরা সত্যিই এবার থ,—অগ্নিদেবের বিরুদ্ধে।

বিরুদ্ধে কেন হবে! তাঁরই মঙ্গলের জন্যে!—ঘনাদা কেদারায় হেলান দিয়ে এবার করুণা করে একটু বিশদ হলেন।—আসলে কৃষ্ণ অর্জুন খাণ্ডব বনে এসেছিলেন ময়দানবকে খুঁজতে। দুনিয়ায় ময়দানবের মত এত বড় কারিগর আর নেই। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের যে সভাঘর তৈরী হবে তার জন্যে ময়দানবকে দরকার।

কিন্তু খাণ্ডব বনের কাছে পৌঁছোতে এক চিমসে হাড্ডিসার বামুন ধুঁকতে ধুঁকতে তাঁদের সামনে এসে হাজির। ধনঞ্জয় চিনতে না পারলেও বাসুদেব তাঁকে দেখেই চিনেছেন।

এ কি অগ্নিদেব! একি চেহারা হয়েছে আপনার!

আর বল কেন!—বলে অগ্নিদেব তাঁর অসুখের যে লম্বা ইতিহাস শুরু করলেন তা আর শেষই হতে চায় না। শেষ পর্যন্ত তা থেকে মোদ্দা কথা যা জানা গেল তা এই যে, শ্বেতকী নামে এক রাজার যজ্ঞের বাতিকেই অগ্নিদেবের শরীরের এই দশা। শ্বেতকী রাজার যজ্ঞ করে আর আশ মেটে না। বছরের পরে বছর এক পুরুত হার মানলে রাজা অন্য পুরুত দিয়ে শুধু যজ্ঞই করে যায়, আর অগ্নিদেবকে সেই অফুরন্ত যজ্ঞে বসে বসে জালা জালা ঘি খেতে হয়। সেই ঘি খেয়ে খেয়েই অগ্নিদেবের এমন অগ্নিমান্দ্য যে কিছু আর

হজম হয় না, কিছু মুখে রোচে না। সারাক্ষণ শুধু পেট জ্বালা আর চোঁয়া ঢেঁকুর।

তা আপনাদের স্বর্গের অতবড় কবিরাজ অশ্বিনীকুমারদের একবার দেখালেই ত পারেন!—না বলে পারলেন না ধনঞ্জয়।

তা কি আর দেখাই নি!!—করুণ স্বরে বললেন অগ্নিদেব,—আর তাঁদের বিধান শুনেই ত আপনাদের কাছে এসেছি।

তাঁদের বিধান শুনে আমাদের কাছে—অর্জুনও অবাক্,—কি তাঁদের বিধান?

বড় কুমার বলেছেন, মাংস খান যত পারেন আর ছোট বলেছেন, সেদ্ধ-টেদ্ধ নয়, শুধু আগুনে ঝলসানো টাটকা মাংস খেতে।—অগ্নিদেব নিজের সমস্যাটা ব্যক্ত করলেন,—তাই এই খাণ্ডব বনটা জ্বালাতে এসেছিলাম। কিন্তু এ বন আবার দেবরাজ ইন্দ্রের খাস তালুক। কোথাও দুটো মরা গাছের শুকনো কাঠ একটু ধরাতে না ধরাতেই একেবারে আকাশ-ফুটো-করা জল ঢেলে নিভিয়ে দেন। এই দুঃখেই আপনাদের কাছে এসেছি। দোহাই আপনাদের, দেবরাজ ইন্দ্রকে যেমন করে হোক ঠেকিয়ে খাণ্ডব বনটা আমায় পুড়িয়ে খেতে দিন।

অগ্নিদেবের মিনতি শেষ হতে না হতেই শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন,—তথাস্তু। আপনি খুশিমত খাণ্ডব বন পোড়ান গিয়ে যান। দেবরাজ ইন্দ্রকে আমরা সামলাচ্ছি।

অগ্নিদেব ত শুনেই খুশী হয়ে চলে গেলেন। অর্জুন কিন্তু হতভম্ব।

এ কি করলে বন্ধু!—কৃষ্ণকে তিনি অবাক্ হয়ে বললেন,—কিছু না ভেবে-চিন্তে অগ্নিদেবকে তথাস্তু বলে দিলে! খাণ্ডব বন আমরা পোড়াতে দেব কেন? এত কষ্ট করে যাঁকে খুঁজতে এসেছি সেই ময়দানব ওখানে থাকেন। তা ছাড়া বনের জন্তু জানোয়ার আমাদের কি করেছে যে, তাদের এমন সর্বনাশে সাহায্য করব! দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গেও বা এমন অন্যায় করে যুদ্ধ করতে যাব কেন?

আহা সত্যি কি ওসব করব নাকি!—হেসে বললেন শ্রীকৃষ্ণ,—দেবরাজকে স্মরণ করে এখুনি চালটা সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। অগ্নিদেব নিজে যা পারেন করুন, আমরা বাইরে থেকে তাঁর হয়ে দারুণ যুদ্ধ করার ভান করে ইন্দ্রদেবকে আগুন নেভাতেই সাহায্য করব।

বলছ কি?—ধনঞ্জয়ের দু চোখ এবার কপালে,—অগ্নিদেবকে অমন মিথ্যে ভরসা দিলে!

দিলাম ওঁরই ভালোর জন্যে!—আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাসুদেব,—শুধু ঘি খেয়ে ত নয়, নাগাড়ে যজ্ঞস্থানে থুস হয়ে বসে বসে ভুজ্যি খেয়ে ওঁর পেটের ওই অবস্থা। মাংসের চেয়ে ওঁর বেশী দরকার একটু ছোটাছুটি। তা এই খাণ্ডব বনে ছোটাতে ছোটাতে ওঁর কাল ঘাম বার করবার ব্যবস্থা করব। উনি কোথাও দুটো শুকনো কাঠ ধরাতে না ধরাতেই দেবরাজ পশলা পশলা বৃষ্টি ঢালবেন তা নেভাতে, আমরাও তা ঠেকাবার নামে পবনদেবকেই রাখব রুখে যাতে আগুন না ছড়ায়। তাতে অগ্নিদেবকে সারাক্ষণ ছোটাছুটিই করতে হবে সারা বন, শুকনো জায়গার খোঁজে। তাতে শিকার যা পান বা না পান তাঁর পেটের রোগ একেবারে যাবে সেরে।

কিন্তু,—অর্জুন একটু আপত্তি জানাতেই শ্রীকৃষ্ণ হেঁকে বললেন,—অগ্নিদেব যদি জানতে পারেন সেই ভয় করছ ত? না সে ভয় নেই। অগ্নিদেব জানবেন আমরা দুজনে যুদ্ধ করে একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছি। কেমন করে জানবেন? ওই যে বায়স ক'টি দেখছ, মাথার ওপর কা কা করছে, ওরা হ'ল বার্তা বিশারদ, সংবাদ দেবার নেবার সাংবাদিকও বলতে পারো। কা, কা করে ওরা খবর কুড়িয়ে আর ছড়িয়ে বেড়ায়। ওদের মুখেই আমাদের চুটিয়ে লড়াই করার খবর অগ্নিদেবকে আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আপাততঃ ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভাতেও এই বিবরণই যাবে। শেষ কালে শুধু ছোট একটু টীকা থাকবে, এ অলীক বিবরণের কারণ বুঝিয়ে তা সংশোধন করার।

ঘনাদা থামলেন।

তারপর নিজে থেকেই আমাদের জিজ্ঞাসাটা আঁচ করে নিয়ে বললেন,—মহাভারতে সে টীকাটা কেন নেই জানতে চাইছ ত? না, দারুক মুষিক কোম্পানি কি বল্মী বিশারদের কাজ এটা নয়। দোষ তালপাতা যোগান যে দিয়েছিল সেই ব্যাপারীর। গণেশঠাকুরকে যে সব তালপাতার যোগান দেওয়া হয়েছিল তার কিছু ছিল রীতিমত পুরোনো, ঘুন-ধরা মুচমুচে। পুঁথির রাশ নাড়াচাড়ার সময় তার খাস্তা হয়ে যাওয়া একটা টুকরো কখন কোথায় খসে পড়েছে কেউ টেরই পায়নি। টীকাটুকু ওখানেই ছিল।

ঘনাদা কেদারা ছেড়ে উঠলেন। তাঁকে আর চাইতে হল না। পকেট থেকে গোটা একটা সিগারেটের টিন বার করে শিশির নিজেই তাঁর হাতে গুঁজে দিল।

—